# নবম অধ্যায়

# ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর

### শ্লোক ১

**শ্রীশুক উবাচ**

**আত্মমায়ামৃতে রাজন্ পরস্যানুভবাত্মনঃ।**
**ন ঘটেতার্থসম্বন্ধঃ স্বপ্নদ্রষ্টুরিবাঞ্জসা ॥ ১ ॥**

**শ্রীশুক উবাচ**—শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন; **আত্ম**—পরমেশ্বর ভগবান; **মায়াম্**—শক্তি; **ঋতে**—বিনা; **রাজন্**—হে রাজন; **পরস্য**—শুদ্ধ আত্মার; **অনুভব-আত্মনঃ**—শুদ্ধ চেতনার; **ন**—কখনোই না; **ঘটেত**—সম্ভব হতে পারে; **অর্থ**—অর্থ; **সম্বন্ধঃ**—জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্ক; **স্বপ্ন**—স্বপ্ন; **দ্রষ্টুঃ**—দর্শকের; **ইব**—সদৃশ; **অঞ্জসা**—সম্পূর্ণরূপে।

### অনুবাদ

**শ্রী শুকদেব গোস্বামী বললেন—হে রাজন্, পরমেশ্বর ভগবানের শক্তির দ্বারা প্রভাবিত না হলে শুদ্ধ আত্মার শুদ্ধ চেতনায় জড় দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কোনই অর্থ হয় না। সেই সম্পর্ক স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নদৃষ্ট দেহের কার্যকলাপ দর্শন করার মতো।**

### তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্ন, জীব তার জড় দেহ এবং মন থেকে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও জড় জগতের বন্ধনে কিভাবে আবদ্ধ হয়ে পড়ে, তার উত্তর এখানে যথার্থ সঠিকভাবে দেওয়া হয়েছে। চিন্ময় আত্মা জড় পদার্থ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু সে আত্ম মায়া নামক ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে জড় বিষয়ে মগ্ন হয়ে পড়ে। সেই তত্ত্ব ইতিমধ্যেই প্রথম স্কন্ধে ব্যাসদেবের পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির উপলব্ধি প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, এবং জীব ভগবানের ইচ্ছার প্রভাবে বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই জীব যদিও তার শুদ্ধ অবস্থায় শুদ্ধ চেতনাময়, তথাপি ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার ব্যাপারে ভগবানের ইচ্ছার অধীন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও

(১৫/১৫) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে বিরাজমান, এবং জীবের চেতনা এবং বিস্মৃতি তাঁর দ্বারাই প্রভাবিত হয়।

এখন স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন ওঠে ভগবান কেন জীবকে এই ধরনের চেতনা এবং বিস্মৃতিতে প্রভাবিত করেন। তাঁর উত্তর হচ্ছে যে ভগবান চান যে তাঁর বিভিন্ন অংশরূপে প্রতিটি জীব যেন শুদ্ধ চেতনায় অবস্থিত হয়ে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়। কেননা সেইটি হচ্ছে তার স্বরূপগত অবস্থা, কিন্তু জীবের যেহেতু আংশিক স্বতন্ত্রতা রয়েছে, তাই সে ভগবানের সেবা করার ইচ্ছা না করে পক্ষান্তরে ভগবানের মতো স্বতন্ত্র হওয়ার চেষ্টা করতে পারে।

সমস্ত অভক্ত জীবেরা ভগবানের মতো শক্তিসম্পন্ন হতে চায়, যদিও তা হওয়া তাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব নয়। জীবেরা ভগবানের ইচ্ছায় মোহাচ্ছন্ন হয়েছে,কেননা তারা তাঁর মতো হতে চেয়েছে। ঠিক যেমন একজন মানুষ উপযুক্ত যোগ্যতা অর্জন না করেই রাজা হতে চায়। জীব যখন ভগবান হওয়ার বাসনা করে, তখন সে এক স্বপ্নবৎ অবস্থায় আচ্ছন্ন হয়। তাই জীবের প্রথম অপরাধ হচ্ছে যে সে ভগবান হতে চেয়েছে এবং তার ফলে সে ভগবানের ইচ্ছায় তার প্রকৃত স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে এক অলীক স্থানের স্বপ্ন দেখে যেখানে সে ভগবানের মতো পরম নিয়ন্তা হতে পারে।

শিশু চাঁদ চেয়ে মায়ের কাছে কাঁদে, আর মা তখন একটি আয়না এনে চাঁদের প্রতিবিম্ব দেখিয়ে ক্রন্দনরত শিশুকে সন্তুষ্ট করে। তেমনই, ভগবান তাঁর ক্রন্দনরত সন্তানদের প্রতিবিম্বস্বরূপ জড় জগৎদান করেন, যাতে তারা কর্মীরূপে ভগবানের মতো তা ভোগ করার চেষ্টা করে নিরাশ হয় এবং অবশেষে তা পরিত্যাগ করে। এই উভয় অবস্থাই স্বপ্নের মতো অলীক।

জীব যে কখন সে বাসনা করেছিল তার বৃত্তান্ত খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করার কোন প্রয়োজন নেই। আসল কথা হচ্ছে যে যখনই সে সেই বাসনা করে, তৎক্ষণাৎ ভগবানের নির্দেশে সে *আত্ম-মায়ার* কবলিত হয়। জড় জগতের বদ্ধ অবস্থায় জীব ভ্রান্তভাবে তাই স্বপ্ন দেখে যে 'এটি আমার' এবং 'এটি আমি'। সেই স্বপ্নাবস্থায় বদ্ধ জীবাত্মা মনে করে যে তার জড় দেহটি হচ্ছে 'আমি', অথবা ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সে হচ্ছে ঈশ্বর এবং তার দেহের সঙ্গে সম্পর্কিত সবকিছুই 'আমার'। এইভাবে জন্ম-জন্মান্তরে 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত ধারণার স্বপ্ন দেখে। যতক্ষণ পর্যন্ত জীব ভগবানের বিভিন্ন অংশরূপে তাঁর অধীনস্থ হওয়ার শুদ্ধ চেতনা লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত সে এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হতে পারে না।

জীবের শুদ্ধ চেতনায় কিন্তু এইপ্রকার কোন ভ্রান্তিজনক স্বপ্ন নেই। সেই শুদ্ধ চেতনায় জীব কখনো বিস্মৃত হয় না যে সে ভগবান নয়, পক্ষান্তরে ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমে ভগবানের নিত্য সেবক।

## শ্লোক ২

**বহুরূপ ইবাভাতি মায়য়া বহুরূপয়া।**
**রমমাণো গুণেষ্বস্যা মমাহমিতি মন্যতে ॥ ২ ॥**

**বহু-রূপঃ**—বিভিন্ন রূপ; **ইব**—যেমন; **আভাতি**—প্রকাশিত; **মায়য়া**—বহিরঙ্গা-শক্তির প্রভাবে; **বহুরূপয়া**—বিবিধ রূপে; **রমমাণঃ**—ভোগ করছে বলে মনেকরে; **গুণেষু**—বিভিন্ন গুণে; **অস্যাঃ**—বহিরঙ্গা-শক্তির; **মমঃ**—আমার; **অহম্**—আমি; **ইতি**—এইভাবে; **মন্যতে**—মনে করে।

## অনুবাদ

**ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির প্রভাবে মোহাচ্ছন্ন হয়ে জীব নানা রূপবিশিষ্ট হয়ে প্রকাশ পায়, এবং সেই মায়ারই গুণসমূহে অভিনিবিষ্ট হয়ে 'আমি' ও 'আমার' এই প্রকার অভিমান করে।**

## তাৎপর্য

জীবের বিভিন্ন রূপ ভগবানের মোহময়ী বহিরঙ্গা শক্তি কর্তৃক প্রদত্ত বিভিন্ন প্রকার বস্ত্রের মতো, যা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি জীবের ভোগ করার বাসনা অনুসারে প্রদান করেন। বহিরঙ্গা প্রকৃতি সত্ত্ব, রজো এবং তমো এই তিনটি গুণের মাধ্যমে প্রকাশিতা হন। তাই জড় জগতেও জীবের স্বতন্ত্রভাবে মনোনয়ন করার সুযোগ রয়েছে, এবং তার আকাঙ্ক্ষা অনুসারে জড়া প্রকৃতি তাকে বিভিন্ন প্রকার জড় শরীর দান করে।

প্রকৃতিতে নয় লক্ষ জলচর, কুড়ি লক্ষ উদ্ভিদ, এগার লক্ষ কৃমি-কীট এবং সরীসৃপ, দশ লক্ষ পক্ষী, ত্রিশ লক্ষ পশু এবং চার লক্ষ মনুষ্য শরীর রয়েছে। অর্থাৎ মোট চুরাশি লক্ষ বিভিন্ন প্রকার শরীর ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে রয়েছে, এবং জীব তার ভোগ করার বাসনা অনুসারে প্রকৃতির বিভিন্ন গুণের দ্বারা পরিচালিত হয়ে বিভিন্ন দেহে ভ্রমণ করে।

এমনকি এক শরীরেই জীব শৈশব থেকে বাল্যে, বাল্য থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে বার্ধক্যে রূপান্তরিত হয়, এবং বার্ধক্যের পর তার কর্ম অনুসারে সৃষ্ট আর একটি দেহে দেহান্তরিত হয়।

জীব তার বাসনা অনুসারে তার দেহ সৃষ্টি করে, এবং ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তি তাকে এমন একটি শরীর দান করেন যার দ্বারা সে পূর্ণরূপে তার বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ পায়। বাঘ অন্য পশুর রক্ত খেতে চায়, এবং তাই জড়া প্রকৃতি ভগবানের নির্দেশে তাকে অন্য পশুদের রক্ত খাওয়ার জন্য একটি বাঘের শরীর দান করেন। তেমনই, যে জীব উচ্চতর গ্রহলোকে দেবতার শরীর প্রাপ্ত হতে চায়, ভগবানের কৃপায় সেই প্রকার দেহ সে প্রাপ্ত হয়। আর তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান হন, তা হলে তিনি চিন্ময় শরীর প্রাপ্ত হয়ে ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করার বাসনা করতে পারেন, এবং ভগবানের কৃপায় তাঁর

সেই বাসনাও চরিতার্থ হয়। অতএব জীবের যে ক্ষুদ্র স্বাতন্ত্র্য রয়েছে, সে তা পূর্ণরূপে ব্যবহার করতে পারে। আর ভগবান এতই কৃপালু যে তিনি জীবের বাসনা অনুসারে তাকে তার দেহ প্রদান করেন। জীবের বাসনা ঠিক সোনার পর্বতের স্বপ্ন দেখার মতো। মানুষ জানে যে পর্বত রয়েছে এবং সে জানে যে সোনাও রয়েছে।কিন্তু তার বাসনার ফলেইকেবল সে সোনার পর্বতের স্বপ্ন দেখে। আর সেই স্বপ্ন যখন ভেঙ্গে যায়, তখন সে দেখে যে তার সামনে অন্য কিছু রয়েছে। জাগরিত অবস্থায় সে দেখে যে সেখানে সোনাও নেই, আর পর্বতও নেই, আর সোনার পর্বতের কি কথা।

জড় জগতে জীবের বিভিন্ন স্থিতি 'আমি' এবং 'আমার' এই ভ্রান্ত ধারণা থেকে উদ্ভূত। কর্মীরা মনে করে যে এই জগৎ 'আমার' এবং জ্ঞানীরা মনে করে যে 'আমি' সবকিছু। সমস্ত রাজনৈতিক, সামাজিক, লোকহিতৈষী, পরার্থবাদ প্রভৃতির জড় ধারণা, বদ্ধ জীবের 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণা প্রসূত, যা হচ্ছে জড়জগতে ভোগ করার তীব্র বাসনার প্রকাশ।জড় দেহ এবং যে স্থানে দেহটি লাভ হয়েছে সেই স্থানের সামাজিক, জাতীয়, পারিবারিক ইত্যাদির আসক্তির কারণ হচ্ছে জীবের প্রকৃত স্বরূপ-বিস্মৃতি। মোহাচ্ছন্ন জীবের এই ভ্রান্ত ধারণা বিদূরিত হতে পারে শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিতের সঙ্গ প্রভাবে, যা শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত হয়েছে।

## শ্লোক ৩

**যর্হি বাব মহিম্নি স্বে পরস্মিন্ কালমায়য়োঃ।**
**রমেত গতসম্মোহস্ত্যক্ত্বোদাস্তে তদোভয়ম্ ॥ ৩ ॥**

**যর্হি**—যে কোন সময়ে; **বাব**—নিশ্চিতভাবে; **মহিম্নি**—মহিমায়; **স্বে**—তার; **পরস্মিন্**—পরমে; **কাল**—সময়ে; **মায়য়োঃ**—জড়া প্রকৃতির; **রমেত**—উপভোগ করে; **গতসম্মোহঃ**—মোহমুক্ত হয়ে; **ত্যক্ত্বা**—পরিত্যাগ করে; **উদাস্তে**—পূর্ণতায়; **তদা**—তখন; **উভয়ম্**—উভয় ('আমি' এবং 'আমার'—এই ভ্রান্ত ধারণা)।

## অনুবাদ

**জীব যখন তার মহিমান্বিত স্বরূপে অবস্থিত হয়ে কাল এবং জড়া প্রকৃতির অতীত অপ্রাকৃত আনন্দ উপভোগ করতে শুরু করে, তখনই জীবনের এই দুটি ভ্রান্ত ধারণার (আমি এবং আমার) মোহ থেকে মুক্ত হয়ে তার শুদ্ধ স্বরূপে পূর্ণরূপে অধিষ্ঠিত হয়।**

## তাৎপর্য

এই দুটি ভ্রান্ত ধারণা, যথা 'আমি' এবং 'আমার' প্রকৃতপক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রকাশিত হয়। নিম্নতর স্তরে 'আমার' ধারণাটি অত্যন্ত প্রবল, এবং উচ্চতর স্তরে 'আমি' ভ্রান্ত ধারণাটি প্রবল। 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি কুকুর বিড়ালের মতো পশুদের

মধ্যেও দেখা যায়, এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করে।

মানব জীবনের নিম্নস্তরেও 'এটি আমার দেহ', 'এটি আমার গৃহ', 'এটি আমার পরিবার', 'এটি আমার বর্ণ', 'এটি আমার জাতি', 'এটি আমার দেশ' ইত্যাদি ভ্রান্ত ধারণার প্রাধান্য দেখা যায়। আর জল্পনা-কল্পনা প্রসূত জ্ঞানের উচ্চতর স্তরে 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি 'আমি' অথবা 'আমিই সবকিছু' ইত্যাদি ধারণায় পর্যবসিত হয়।

বহু শ্রেণীর মানুষ বিভিন্নরূপে 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি পোষণ করছে। কিন্তু প্রকৃত 'আমি' কে তখনই উপলব্ধি করা যায় যখন আমরা নিজেকে'আমি পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য দাস' রূপে চিনতে পারি। সেটিই হচ্ছে শুদ্ধ চেতনা এবং সমগ্র বৈদিক শাস্ত্রে আমাদের সেই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে।

'আমি ভগবান' অথবা 'আমি পরমেশ্বর' এই ভ্রান্ত ধারণা 'আমার' ভ্রান্ত ধারণাটি থেকেও অধিক মারাত্মক। যদিও বৈদিক শাস্ত্রে কখনো কখনো ভগবানের সঙ্গে একত্ব অনুভব করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে কোন জীব সর্বতোভাবে ভগবানের সমান।

জীবের সঙ্গে ভগবানের যে নানা বিষয়ে ঐক্য রয়েছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু চরমে জীব ভগবানের অধীন এবং তার অস্তিত্বের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি সাধন করা। তাই ভগবান বদ্ধ জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দেন। জীব যদি ভগবানের ইচ্ছার অধীন না হত, তা হলে ভগবান কেন জীবদের তাঁর শরণাগত হওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন ? জীব যদি সর্বতোভাবে ভগবানের সমকক্ষ হত, তা হলে কেন তাকে মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হতে হয় ?

পূর্বে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি যে জড়া প্রকৃতি ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/১০) ভগবানের জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করার ক্ষমতা প্রতিপন্ন হয়েছে। যে জীব নিজেকে পরম পুরুষ বলে দাবী করে, সে কি জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম ? মূর্খ 'আমি' উত্তর দেবে যে সে ভবিষ্যতে তা করবে। যদি মেনেই নেওয়া যায় যে ভবিষ্যতে সে ভগবানের মতো জড়া প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, তা হলে কেন সে বর্তমানে জড়া প্রকৃতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে ?

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ভগবানের শরণাগত হওয়ার ফলে জীব জড়া প্রকৃতির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হতে পারে। কিন্তু সে যদি ভগবানের শরণাগত না হয়, তা হলে জড়া প্রকৃতির উপর আধিপত্য করা তো দূরের কথা, সে জড়া প্রকৃতির বন্ধন থেকেই মুক্ত হতে পারবে না।

তাই ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিষ্ঠা সহকারে যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে 'আমি' ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। কোন বৃত্তিহীন অথবা চাকরিহীন দরিদ্র মানুষ নানারকম দুঃখ-দুর্দশা ভোগ করে, কিন্তু ঘটনাক্রমে সে যদি কোন ভাল সরকারি চাকরি পায় তা হলে সে তৎক্ষণাৎ সুখী হয়। সমস্ত শক্তির নিয়ন্তা ভগবানের পরমেশ্বরত্ব

অস্বীকার করার ফলে কোন লাভ হয় না, পক্ষান্তরে পরমেশ্বর ভগবানের নিত্য সেবক হওয়ার শুদ্ধ চেতনায় অধিষ্ঠিত হওয়ার ফলে জীব তার পূর্ণ মহিমান্বিত স্বরূপে অধিষ্ঠিত হতে পারে।

বদ্ধ অবস্থায় জীব মায়ার দাসত্ব করে, আর মুক্ত অবস্থায় সে ভগবানের শুদ্ধ, অকিঞ্চন সেবক। ভগবানের সেবার জগতে প্রবেশ করার যোগ্যতা হচ্ছে জড়া প্রকৃতির গুণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া। জীব যতক্ষণ তার মনের দাসত্ব করে ততক্ষণ সে 'আমি' এবং 'আমার' রোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হতে পারে না।

পরম সত্য কখনো মায়ার দ্বারা কলুষিত হন না, কেননা তিনি হচ্ছেন মায়ার অধীশ্বর। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য মায়ার দ্বারা আবৃত হতে পারে। কিন্তু সর্বোত্তম উদ্দেশ্য তখনই সাধিত হয় যখন কেউ সরাসরিভাবে পরম সত্যের সম্মুখীন হয়, ঠিক সূর্যের প্রতি উন্মুখ হওয়ার মতো। আকাশে সূর্য জ্যোতির্ময়, কিন্তু যখন আকাশে সূর্যকে দেখা যায় না তখন সবকিছু অন্ধকার হয়ে যায়। তেমনই, কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি উন্মুখ হয় তখন সে সম্পূর্ণরূপে মায়ার মোহময়ী প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, এবং যে তা করে না সে মায়ার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৪/২৬) সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন করে বলা হয়েছে—

মাং চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥

তাই মানুষের কর্তব্য হচ্ছে নিষ্ঠাপূর্বক ভগবানের পূজা, ভগবানের মহিমা কীর্তন, যথাযথ সূত্রে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ (পেশাদারী ভাগবত পাঠকদের কাছে কখনো শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নয়, পক্ষান্তরে তা শ্রবণ করা উচিত শ্রীমদ্ভাগবতের আদর্শ অনুসারে জীবনযাপনকারী ব্যক্তির কাছে) এবং শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন করা। 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণার দ্বারা কখনো বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয়। কর্মীরা 'আমার' ধারণার প্রতি অনুরক্ত, আর জ্ঞানীরা 'আমি' ধারণার প্রতি অনুরক্ত, এবং তারা উভয়ই মায়ার বন্ধন থেকে মুক্ত হওগার অযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবত এবং মুখ্যত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, উভয়েরই উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবকে 'আমি', 'আমার' ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত করা, এবং শ্রীল ব্যাসদেব সেগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন বদ্ধ জীবদের মুক্ত করার উদ্দেশ্যেই। জীবের কর্তব্য হচ্ছে অপ্রাকৃত স্তরে অধিষ্ঠিত হওয়া, যেখানে কাল এবং জড়া প্রকৃতির কোন প্রভাব নেই। বদ্ধ অবস্থায় জীব অতীত, বর্তমান, এবং ভবিষ্যতের স্বপ্নরূপ কালের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত।

জ্ঞানীরা জ্ঞানের অনুশীলনের মাধ্যমে অহঙ্কারকে জয় করে বাসুদেব বা পরমেশ্বর ভগবান হয়ে কালের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চায়। কিন্তু এই পন্থাটি যথাযথ নয়। প্রকৃত পন্থা হচ্ছে বাসুদেবকে পরমেশ্বর ভগবানরূপে জেনে, জ্ঞানের যথার্থ পূর্ণতা সাধনের মাধ্যমে তাঁর শরণাগত হওয়া, কেননা তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর উৎস। সেই জ্ঞান অর্জন

করার মাধ্যমেই কেবল 'আমি' এবং 'আমার' ভ্রান্ত ধারণা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবত উভয় শাস্ত্রেই এই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীল ব্যাসদেব ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং ভক্তিযোগের পন্থা বর্ণনা করে শ্রীমদ্ভাগবতরূপী মহান শাস্ত্রগ্রন্থ মায়াচ্ছন্ন জীবদের উপহার দিয়েছেন, এবং বদ্ধ জীবদের কর্তব্য হচ্ছে এই মহান বিজ্ঞানের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা।

## শ্লোক ৪

**আত্মতত্ত্ববিশুদ্ধ্যর্থং যদাহ ভগবানৃতম।**
**ব্রহ্মণে দর্শয়ন্ রূপমব্যলীকব্রতাদৃতঃ ॥ ৪ ॥**

**আত্ম-তত্ত্ব**—ভগবান অথবা জীবের তত্ত্ব সম্বন্ধীয় বিজ্ঞান; **বিশুদ্ধি**—পবিত্রীকরণ; **অর্থম্**—লক্ষ্য; **যৎ**—যা; **আহ**—বলেছেন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **ঋতম্**—বাস্তবিকভাবে; **ব্রহ্মণে**—ব্রহ্মাকে; **দর্শয়ন্**—প্রদর্শন করে; **রূপম্**—নিত্য রূপ; **অব্যলীক**—নিষ্কপটে; **ব্রত**—সংকল্প; **আদৃতঃ**—পূজিত।

## অনুবাদ

**হে রাজন্! ব্রহ্মার ভক্তিময় নিষ্কপট তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর সম্মুখে নিজের শাশ্বত দিব্য রূপ প্রকাশ করলেন। বদ্ধ জীবদের পবিত্র করার এইটি হচ্ছে অভীষ্ট লক্ষ্য।**

## তাৎপর্য

*আত্ম-তত্ত্ব* ভগবান এবং জীবাত্মা উভয়েরই বিজ্ঞান। পরমেশ্বর ভগবান এবং জীব উভয়কেই আত্মা বলা হয়। পরমেশ্বর ভগবানকে বলা হয় *পরমাত্মা* এবং জীবকে বলা হয় *আত্মা, ব্রহ্ম* অথবা *জীব*। পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়ই জড়া প্রকৃতির অতীত হওয়ার ফলে *আত্মা* নামে পরিচিত। তাই শুকদেব গোস্বামী পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই তত্ত্ব বিশুদ্ধভাবে হৃদয়ঙ্গম করার উদ্দেশ্যে এই শ্লোক বিশ্লেষণ করেছেন। সাধারণত মানুষদের পরমাত্মা এবং জীবাত্মা উভয়েরই সম্পর্কের নানারকম ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। জীবাত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে জড় দেহকে বিশুদ্ধ আত্মা বলে মনে করা, এবং পরমাত্মা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে তাঁকে জীবের সমকক্ষ বলে মনে করা। কিন্তু ভক্তিযোগের একটি আঘাতেই সেই উভয় ভ্রান্ত ধারণাই বিদূরিত হয়ে যায়, ঠিক যেমন সূর্যের উদয়ে অন্ধকার বিদূরিত হলে সূর্য, পৃথিবী এবং পৃথিবীর অন্তর্বর্তী সবকিছু যথাযথভাবে দর্শন করা যায়। অন্ধকারে সূর্যকে দেখা যায় না, নিজেকে দেখা যায় না অথবা এই পৃথিবীর কোনকিছুই দেখা যায় না। কিন্তু সূর্যালোকের প্রভাবে সূর্যকে, নিজেকে এবং আমাদের চারপাশের জগতকে দেখা যায়। তাই শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেছেন যে উভয় ভ্রান্ত ধারণা নির্মূল করার জন্য ভগবান ব্রহ্মার নিষ্কপটে ভক্তিযোগ

সম্পাদন করার ব্রতে সম্পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হয়ে ব্রহ্মার সম্মুখে তাঁর শাশ্বত রূপ প্রকাশ করেছিলেন। ভক্তিযোগ ব্যতীত আত্ম-তত্ত্ব-উপলব্ধির অন্য সমস্ত পন্থা কালক্রমে ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান বলেছেন যে ভক্তিযোগের দ্বারাই কেবল তাঁকে পূর্ণরূপে জানা যায়, এবং তখন ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানে প্রবেশ করা যায়। ব্রহ্মাজী ভক্তিযোগ অনুশীলন করার উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তার ফলে তিনি ভগবানের দিব্য রূপ দর্শন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দিব্য রূপ সম্পূর্ণরূপে চিন্ময়, এবং শুদ্ধ ভক্তিযোগে যথাযথভাবে তপস্যা করার ফলে চিন্ময় দৃষ্টির দ্বারাই কেবল তাঁকে দর্শন করা যায়। ব্রহ্মার সম্মুখে ভগবান যে রূপ প্রকাশ করেছিলেন তা জড় জগতে আমাদের যে রূপ দর্শন হয় তেমন কোন রূপ ছিল না। ব্রহ্মাজী কোন জড় রূপ দর্শন করার জন্য এইভাবে কঠোর তপস্যা করেননি। অতএব, ভগবানের রূপ সম্বন্ধে মহারাজ পরীক্ষিতের প্রশ্নের উত্তর এখানে পাওয়া যাচ্ছে। ভগবানের রূপ সচ্চিদানন্দঘন, অর্থাৎ তা নিত্য, পূর্ণ জ্ঞানময় এবং পূর্ণ আনন্দময়। কিন্তু জড় জগতে জীবের রূপ নিত্য নয়, জ্ঞানময় নয় অথবা আনন্দময় নয়। সেটিই হচ্ছে ভগবানের রূপ এবং বদ্ধ জীবের রূপের মধ্যে পার্থক্য। বদ্ধ জীবেরা কিন্তু ভক্তিযোগের মাধ্যমে কেবল ভগবানকে দর্শন করার ফলেই তাদের সচ্চিদানন্দময় রূপ ফিরে পেতে পারে।

এখানে সার তত্ত্ব হচ্ছে এই যে অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে পড়ার ফলে বদ্ধ জীব নশ্বর ভৌতিক রূপে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। কিন্তু পরমেশ্বর ভগবানের রূপ নশ্বর বদ্ধ জীবের রূপের মতো নয়, তিনি সর্বদা জ্ঞানময় এবং আনন্দময়। বদ্ধ জীব এবং ভগবানের মধ্যে এটিই হচ্ছে পার্থক্য। ভক্তিযোগের মাধ্যমে এই পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ব্রহ্মাকে ভগবান চারটি মূল শ্লোকে শ্রীমদ্ভাগবতের সারাংশ শুনিয়েছিলেন। এই শ্রীমদ্ভাগবত মনোধর্মী জ্ঞানীদের কল্পনাপ্রসূত নয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ধ্বনি অপ্রাকৃত, এবং তার অনুরণন বেদের ধ্বনি থেকে অভিন্ন। এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের বিষয় হচ্ছে ভগবান এবং জীব উভয়ই। নিয়মিত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করার ফলে ভক্তিযোগের অনুশীলন হয়, এবং শ্রীমদ্ভাগবতের সঙ্গ করার ফলে পরম সিদ্ধি লাভ হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে শুকদেব গোস্বামী এবং মহারাজ পরীক্ষিৎ উভয়েই সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

## শ্লোক ৫

**স আদিদেবো জগতাং পরো গুরুঃ**
**স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় সিসৃক্ষয়ৈক্ষত।**
**তাং নাধ্যগচ্ছদ্ দৃশমত্র সম্মতাং**
**প্রপঞ্চনির্মাণবিধির্যয়া ভবেৎ ॥ ৫ ॥**

**সঃ**—তিনি; **আদি-দেবঃ**—প্রথম দেবতা; **জগতাম্**—ব্রহ্মাণ্ডের; **পরঃ**—পরম; **গুরুঃ**—গুরুদেব; **স্বধিষ্ণ্যম্**—তাঁর কমলাসন; **আস্থায়**—তাঁর উৎস খুঁজে পাওয়ার

উদ্দেশ্যে ; **সিসৃক্ষয়া**—ব্রহ্মাণ্ডের বিষয়সমূহ সৃষ্টি করার জন্য ; **ঐক্ষত**—চিন্তা করতে শুরু করেছিলেন ; **তাম্**— সেই বিষয়ে ; **ন**—পারেননি ; **অধ্যগচ্ছৎ**—হৃদয়ঙ্গম করতে ; **দৃশম্**—দিক ; **অত্র**—সেখানে ; **সম্মতাম্**—সঠিক উপায় ; **প্রপঞ্চ**—জড় ; **নির্মাণ**—রচনা ; **বিধিঃ**—বিধি ; **যয়া**— যতখানি ; **ভবেৎ**—হওয়া উচিত।

## অনুবাদ

**প্রথম গুরু এবং ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব হওয়া সত্ত্বেও ব্রহ্মা তাঁর কমলাসনের উৎস খুঁজে পেলেন না ; এবং জড় জগৎ সৃষ্টি করার বিষয়ে তিনি যখন চিন্তা করছিলেন তখন তিনি বুঝে উঠতে পারেননি কিভাবে এই কার্য শুরু করা যায়। তিনি বুঝতে পারেননি কোন্ পন্থায় এই কার্য সম্পাদন করা যায়।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকটি ভগবানের রূপ এবং তাঁর ধামের দিব্য প্রকৃতির বিশ্লেষণের প্রস্তাবনা। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে ইতিমধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর স্বীয় ধামে বিরাজ করেন এবং মায়া-শক্তি তাঁকে স্পর্শ পর্যন্ত করতে পারে না। সুতরাং ভগবানের ধাম কল্পনা নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে বৈকুণ্ঠ নামক সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং অপ্রাকৃত লোকসমূহ। এই অধ্যায়ে তা বিশ্লেষণ করা হবে।

জড় আকাশের অনেক ঊর্ধ্বে এই চিদাকাশ এবং তার সমস্ত সামগ্রীর জ্ঞান ভক্তিযোগের দ্বারাই কেবল সম্ভব। ব্রহ্মাও তাঁর সৃষ্টি করার ক্ষমতা লাভ করেছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে। সৃষ্টির বিষয়ে ব্রহ্মা মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন, এবং তিনি তাঁর অস্তিত্বের উৎস পর্যন্ত খুঁজে পাননি। কিন্তু সেই সমস্ত বিষয়ে তিনি পূর্ণজ্ঞান লাভ করেছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে। ভক্তিযোগের মাধ্যমে ভগবানকে দর্শন করা সম্ভব হয়, এবং ভগবানকে পরমেশ্বর রূপে জানার ফলে অন্য সবকিছু জানা যায়। যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে জানেন, তিনি সবকিছু জানেন। সেটিই সমস্ত বেদের সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মাণ্ডের প্রথম গুরু পর্যন্ত ভগবান কর্তৃক জ্ঞানের আলোকপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, অতএব ভগবানের কৃপা ব্যতীত কে সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণজ্ঞান লাভ করতে পারে? কেউ যদি সবকিছু সম্বন্ধে পূর্ণ জ্ঞান লাভ করতে চান, তাহলে তাঁকে অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভ করতে হবে, এবং এছাড়া আর অন্য কোন পন্থা নেই। ব্যক্তিগত ক্ষমতার উপর নির্ভর করে জ্ঞান লাভ করার প্রচেষ্টা সময়ের অপচয় মাত্র।

## শ্লোক ৬

**স চিন্তয়ন্ দ্ব্যক্ষরমেকদাম্ভ—**
**স্যুপাশৃণোদ্ দ্বির্গদিতং বচো বিভুঃ।**
**স্পর্শেষু যৎষোড়শমেকবিংশং**
**নিষ্কিঞ্চনানাং নৃপ যদ্ধনং বিদুঃ ॥ ৬ ॥**

**সঃ**—তিনি; **চিন্তয়ন্**—এইভাবে চিন্তা করার সময়; **দ্বি**—দুই; **অক্ষরম্**—অক্ষর; **একদা**—একসময়; **অম্ভসি**—জলে; **উপাশৃণোৎ**—নিকটে শ্রবণ করেছিলেন; **দ্বিঃ**—দুইবার; **গদিতম্**—উচ্চারিত; **বচঃ**—বাণী; **বিভুঃ**—মহান; **স্পর্শেষু**—স্পর্শাক্ষর; **যৎ**—যা; **ষোড়শম্**—ষোল; **একবিংশম্**—একবিংশতি; **নিষ্কিঞ্চনানাম্**—সন্ন্যাস আশ্রমের; **নৃপ**—হে রাজন; **যৎ**—যা; **ধনম্**—সম্পদ; **বিদুঃ**—যথার্থভাবে জ্ঞাত।

## অনুবাদ

**তিনি যখন এইভাবে চিন্তা করছিলেন, তখন জলের মধ্য থেকে দুটি অক্ষর তিনি দুবার উচ্চারিত হতে শুনতে পেলেন। সেই শব্দের প্রথম বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের ষোড়শ অক্ষর (অর্থাৎ ত) এবং দ্বিতীয় বর্ণটি স্পর্শ বর্ণের একবিংশ (অর্থাৎ প)। হে রাজন! এই *তপ* শব্দটি নিষ্কিঞ্চন ত্যাগীর একমাত্র ধন বলে পরিজ্ঞাত।**

## তাৎপর্য

সংস্কৃত ভাষায় ব্যঞ্জন বর্ণগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত, যথা স্পর্শ বর্ণ এবং তালব্য বর্ণ। ক থেকে ম পর্যন্ত অক্ষরগুলিকে বলা হয় স্পর্শ বর্ণ, এবং ষোড়শ অক্ষর হচ্ছে ত এবং একবিংশতি অক্ষর হচ্ছে *প*। তাদের সমন্বয়ের ফলে *তপ* শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। এই তপ বা তপস্যা হচ্ছে ব্রাহ্মণ এবং ত্যাগীদের সৌন্দর্য ও সম্পদ। ভাগবত দর্শন অনুসারে প্রতিটি মানুষেরই জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে তপ, কেননা তপস্যা দ্বারাই কেবল আত্ম-উপলব্ধি সম্ভব, এবং আত্ম-উপলব্ধিই হচ্ছে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, ইন্দ্রিয় তৃপ্তি নয়। এই *তপ* বা তপস্যা সৃষ্টির আদি থেকেই শুরু হয়েছিল, এবং পরম গুরুদেব শ্রীব্রহ্মা প্রথমে এই তপস্যার পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। তপস্যার দ্বারাই কেবল মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সাধন সম্ভব, চাকচিক্যপূর্ণ পাশবিক সভ্যতার দ্বারা নয়। পশুরা আহার, পান এবং আনন্দ উপভোগের দ্বারা ইন্দ্রিয় তৃপ্তি ব্যতীত আর কিছু জানে না। কিন্তু মানুষের কর্তব্য হচ্ছে তপস্যার পন্থা গ্রহণ করার মাধ্যমে ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়া।

ব্রহ্মা যখন ব্রহ্মাণ্ডের জড় সৃষ্টির ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে তাঁর কমলাসনের উৎস খুঁজে পাওয়ার উদ্দেশ্যে জলের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি দুবার তপ শব্দটি শ্রবণ করেন। তপস্যার পন্থা গ্রহণ হচ্ছে উপযুক্ত শিষ্যের দ্বিতীয় জন্ম। *উপশৃণোৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূণ। এই শব্দটি *উপনয়ন* শব্দটির সমান, অর্থাৎ তপস্যার পন্থা গ্রহণ করার জন্য শিষ্যকে সদ্‌গুরুর সমীপে আনয়ন। এইভাবে ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন এবং সে কথা ব্রহ্মা স্বয়ং *ব্রহ্ম-সংহিতায়* ব্যক্ত করেছেন। *ব্রহ্ম-সংহিতায়* প্রতিটি শ্লোকে ব্রহ্মা প্রার্থনা করেছেন, *গোবিন্দম্ আদি পুরুষং তমহং ভজামি*। এইভাবে ব্রহ্মা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, এবং তার ফলে তিনি বিশাল ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পাদনে সক্ষম হওয়ার পূর্বের বৈষ্ণব বা ভগবদ্ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন।

*ব্রহ্ম-সংহিতায়* উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মা অষ্টাদশ অক্ষর সমন্বিত কৃষ্ণ মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিলেন, যা সাধারণত সমস্ত কৃষ্ণ ভক্তরা গ্রহণ করে থাকেন। আমরা সেই পন্থা অনুসরণ করি, কেননা আমরা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস, ব্যাস থেকে মধ্বমুনি এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে মাধবেন্দ্র পুরী, ঈশ্বর পুরী, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হয়ে গুরু-পারম্পর্যে অবশেষে আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের পরম্পরায় আমরা অন্তর্ভুক্ত।

যিনি এইভাবে গুরু-পরম্পরা ধারায় দীক্ষিত হন, তিনি একই ফল বা সৃষ্টি করবার ক্ষমতা অর্জন করেন। এই দিব্য মন্ত্র উচ্চারণ করাই হচ্ছে ভগবানের নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্তের একমাত্র আশ্রয়। এই প্রকার তপস্যা দ্বারাই কেবল ভগবদ্ভক্ত ব্রহ্মার মতো সর্বসিদ্ধি লাভ করেন।

## শ্লোক ৭

**নিশম্য তদ্বক্তৃদিদৃক্ষয়া দিশো**
**বিলোক্য তত্রান্যদপশ্যমানঃ।**
**স্বধিষ্ণ্যমাস্থায় বিমৃশ্য তদ্ধিতং**
**তপস্যুপাদিষ্ট ইবাদধে মনঃ ॥ ৭ ॥**

**নিশম্য**—শ্রবণ করে; **তৎ**—তা; **বক্তৃ**—বক্তা; **দিদৃক্ষয়া**—কে তা বলেছে তা জানবার জন্য; **দিশঃ**—সমস্ত দিকে; **বিলোক্য**—দেখে; **তত্র**—সেখানে; **অন্যৎ**—অন্য কেউ; **অপশ্যমানঃ**—না দেখে; **স্বধিষ্ণ্যম্**—তাঁর কমলাসনে; **আস্থায়**—বসে; **বিমৃশ্য**—চিন্তা করে; **তৎ**—তা; **হিতম্**—কল্যাণ; **তপসি**—তপস্যায়; **উপাদিষ্ট**—যেভাবে তিনি আদিষ্ট হয়েছিলেন; **ইব**—তা পালন করার জন্য; **আদধে**—দিয়েছিলেন; **মনঃ**—মনযোগ।

## অনুবাদ

**সেই শব্দটি শুনে ব্রহ্মা চতুর্দিকে সেই শব্দের উচ্চারণকারীকে অন্বেষণের চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অন্য কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি স্থির করেছিলেন যে তাঁর কমলাসনে উপবিষ্ট হয়ে, সেই নির্দেশ অনুসারে মনোযোগ দিয়ে তপস্যা করাই সমীচীন।**

## তাৎপর্য

জীবনে সাফল্য অর্জন করার জন্য প্রথম সৃষ্ট জীব ব্রহ্মার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা উচিত। তপস্যা করার জন্য পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার পর তিনি তপস্যা করার সংকল্প করেছিলেন এবং চতুর্দিকে দর্শন করে অন্য আর কাউকে খুঁজে না পেয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ভগবান স্বয়ং তাঁকে প্রেরণ করেছেন। সেই সময় ব্রহ্মাই ছিলেন

একমাত্র জীব, কেননা তখন অন্য আর কারো সৃষ্টি হয়নি এবং অন্য আর কাউকে তাই খুঁজে পাননি। শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে, প্রথম স্কন্ধের প্রথম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মা তাঁর অন্তরে ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন। পরমাত্মা রূপে ভগবান প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান, এবং যেহেতু ব্রহ্মা দীক্ষা লাভের বাসনা করেছিলেন, তাই তিনি ব্রহ্মাকে দীক্ষা দিয়েছিলেন। এইভাবে যারা দীক্ষা গ্রহণে ইচ্ছুক, তাদের ভগবান এইভাবে দীক্ষা দিতে পারেন।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে ব্রহ্মা হচ্ছেন এই ব্রহ্মাণ্ডের আদি গুরু, এবং যেহেতু তিনি স্বয়ং ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাই তাঁর মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের বাণী গুরু-শিষ্য-পরম্পরার মাধ্যমে প্রবাহিত হচ্ছে। সুতরাং শ্রীমদ্ভাগবতের প্রকৃত তত্ত্ব লাভ করার জন্য গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারায় বর্তমান যোগ সূত্র বা প্রকট গুরুর সমীপবর্তী হওয়া কর্তব্য। পরম্পরার ধারায় সদ্‌গুরু কর্তৃক দীক্ষিত হওয়ার পর ভগবদ্ভক্তি সম্পাদনের জন্য তপস্যা করা কর্তব্য। কিন্তু তা বলে কখনো মনে করা উচিত নয় যে তিনিও ব্রহ্মার মতো অন্তরে সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক দীক্ষিত হবেন, কেননা এই যুগে কেউই ব্রহ্মার মতো নির্মল নন। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকার্য সম্পাদন করার জন্য ব্রহ্মার পদ সবচাইতে পবিত্র জীবকে দেওয়া হয়, এবং সে রকম যোগ্যতা না থাকলে ব্রহ্মাজীর মতো ভগবান কর্তৃক সরাসরিভাবে ভগবানের কৃপা লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু সেই একই সুবিধা ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মাধ্যমে, শাস্ত্রের মাধ্যমে (বিশেষ করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং শ্রীমদ্ভাগবতের মাধ্যমে) ও সদ্‌গুরুর মাধ্যমে ঐকান্তিকভাবে আগ্রহী জীবের পক্ষে লাভ করা সম্ভব। ভগবানের সেবায় অভিলাষী ঐকান্তিক ব্যক্তিদের কাছে ভগবান স্বয়ং সদ্‌গুরুরূপে আবির্ভূত হন। তাই ঐকান্তিক ভক্তের কাছে আবির্ভূত হয়েছেন যে সদ্‌গুরু, তাঁকে পরমেশ্বর ভগবানের সবচাইতে অন্তরঙ্গ এবং প্রিয় প্রতিনিধি বলে গ্রহণ করা উচিত। এই প্রকার সদ্‌গুরুর নির্দেশনায় কেউ যখন ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করেন, তখন নিঃসন্দেহে বুঝতে হবে যে তিনি ভগবানের কৃপা লাভ করেছেন।

## শ্লোক ৮

**দিব্যং সহস্রাব্দমমোঘদর্শনো**
**জিতানিলাত্মা বিজিতোভয়েন্দ্রিয়ঃ।**
**অতপ্যত স্মাখিললোকতাপনং**
**তপস্তপীয়াংস্তপতাং সমাহিতঃ ॥ ৮ ॥**

**দিব্যম্**—স্বর্গের দেবতাদের; **সহস্র**—এক হাজার; **অব্দম্**—বর্ষ; **অমোঘ**—নিষ্কলঙ্ক, নির্মল; **দর্শনঃ**—জীবনের এই প্রকার দর্শন যিনি লাভ করেছেন; **জিত**—নিয়ন্ত্রিত; **অনিল**—প্রাণবায়ু; **আত্মা**—মন; **বিজিত**—নিয়ন্ত্রিত; **উভয়**—উভয়; **ইন্দ্রিয়ঃ**—এই

প্রকার যাঁর ইন্দ্রিয় ; **অতপ্যত**—তপস্যা করে ; **স্ম**—অতীতে ; **অখিল**—সমস্ত ; **লোক**—গ্রহ ; **তাপনম্**—প্রকাশ করে ; **তপঃ**—তপশ্চর্যা ; **তপীয়ান্**—অত্যন্ত কঠোর তপস্যা ; **তপতাম্**—সমস্ত তপস্বীদের ; **সমাহিতঃ**—এইভাবে অবস্থিত ।

## অনুবাদ

**ব্রহ্মা এক সহস্র দিব্য বর্ষ তপস্যা করেছিলেন । তিনি আকাশে এই অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণ করেন এবং তিনি তা দিব্য বলে গ্রহণ করেছিলেন । এইভাবে তিনি তাঁর মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করেছিলেন এবং যে তপস্যা তিনি করেছিলেন তা সমস্ত জীবের পক্ষে এক আদর্শ শিক্ষা । এইভাবে তিনি সমস্ত তপস্বীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তপস্বী বলে স্বীকৃত হয়েছেন ।**

## তাৎপর্য

ব্রহ্মাজী তপ শব্দটি শ্রবণ করেছিলেন, কিন্তু শব্দ উচ্চারণকারী ব্যক্তিকে দর্শন করেননি ।কিন্তু তবু তিনি নিজের হিতের জন্য সেই উপদেশ গ্রহণ করেছিলেন, এবং তাই স্বর্গের গণনা অনুসারে এক হাজার বছর ধরে ধ্যানে আবিষ্ট ছিলেন । স্বর্গীয় গণনা অনুসারে এক বছর হল আমাদের ৬×৩০×১২×১০০০ বছরের সমান । ভগবানের পরম প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর বিশুদ্ধ দর্শনের জন্যই তিনি সেই শব্দ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । আর তাঁর অভ্রান্ত দর্শনের জন্যই তিনি ভগবান এবং তাঁর বাণীর মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করেননি । ভগবান এবং তাঁর থেকে আগত শব্দব্রহ্মের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, এমনকি তিনি যদি স্বয়ং উপস্থিত নাও থাকেন । এই ধরনের দিব্য উপদেশ গ্রহণ করাই হচ্ছে উপলব্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ পন্থা, এবং সকলের আদিগুরু ব্রহ্মা এই প্রকার অপ্রাকৃত জ্ঞান লাভের ক্ষেত্রে এক জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত । অ-প্রাকৃত শব্দতরঙ্গের অনুরণনকারী আপাতভাবে স্বয়ং উপস্থিত না থাকলেও তাতে শব্দের শক্তি হ্রাস পায় না । তাই শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা অন্য যে কোন শাস্ত্র গ্রন্থকে অ-প্রাকৃত শক্তিবিহীন সাধারণ জড় শব্দসম্ভূত বলে কখনোই মনে করা উচিত নয় ।

অপ্রাকৃত শব্দব্রহ্ম যথার্থ সূত্র থেকে গ্রহণ করতে হবে এবং এটিকে বাস্তব বস্তু বলে গ্রহণ করে নির্দ্বিধায় তা পালন করতে হবে । সদ্‌গুরুর মত যথার্থ মাধ্যম থেকে এই শব্দ গ্রহণই সাফল্যের প্রকৃত রহস্য । জড়ে উদ্ভূত প্রাকৃত শব্দের কোন শক্তি নেই, এবং ঠিক তেমনই, অননুমোদিত ব্যক্তির কাছ থেকে গৃহীত অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গেরও কোন শক্তি থাকে না । এই প্রকার অপ্রাকৃত শক্তি নিরূপণের জন্য যথেষ্ট যোগ্যতা থাকা প্রয়োজন, এবং যোগ্যতার বলেই হোক বা দৈবাৎ সৌভাগ্যের ফলেই হোক, কেউ যদি অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গ সদ্‌গুরুর কাছ থেকে লাভ করতে সমর্থ হন তাহলে তাঁর মুক্তির পথ প্রশস্ত । কিন্তু শিষ্যকে অবশ্যই সদ্‌গুরুর আদেশ পালনের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, ঠিক যেভাবে ব্রহ্মা তাঁর গুরুদেব স্বয়ং ভগবানের আদেশ পালন করেছিলেন । সদ্‌গুরুর

আদেশ পালন করাই শিষ্যের একমাত্র কর্তব্য, এবং সম্পূর্ণ বিশ্বস্ততার সঙ্গে সদ্‌গুরুর এইরকম আদেশ পালনই হচ্ছে সাফল্যের প্রকৃত রহস্য।

ব্রহ্মা তাঁর জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন, কেননা তাঁর ভগবানের আদেশ পালনের জন্য এই ইন্দ্রিয়গুলিকে নিযুক্ত করার প্রয়োজন ছিল। তাই ইন্দ্রিয় নিয়ন্ত্রণের অর্থ হল সেগুলিকে ভগবানের দিব্য সেবায় নিযুক্ত করা। ভগবানের আদেশ গুরু-পরম্পরায় ধারায় সদ্‌গুরুর মাধ্যমে অবতরণ করে, এবং তাই তাঁর আদেশ পালন করাই হচ্ছে প্রকৃত ইন্দ্রিয়-সংযম। পূর্ণ বিশ্বাস এবং নিষ্ঠা সহকারে এইরকম তপস্যা করার ফলে ব্রহ্মাজী এত শক্তি অর্জন করেছিলেন যে তিনি ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা হয়েছিলেন। আর যেহেতু তিনি এই প্রকার শক্তি অর্জন করেছিলেন, তাই তাঁকে তপস্বীকুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে অভিহিত করা হয়।

## শ্লোক ৯

**তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ**
**সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎ পরম্।**
**ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহসাধ্বসং**
**স্বদৃষ্টবদ্ভির্পুরুষৈরভিষ্টুতম্ ॥ ৯ ॥**

**তস্মৈ**—তাঁকে; **স্বলোকম্**—তাঁর স্বীয় লোক বা ধাম; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **সভাজিতঃ**—ব্রহ্মার তপস্যায় প্রসন্ন হয়ে; **সন্দর্শয়ামাস**—প্রকাশ করেছিলেন; **পরম্**—পরম; **ন**—না; **যৎ**—যাঁর; **পরম্**—তাঁর থেকেও শ্রেষ্ঠ; **ব্যপেত**—সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করে; **সংক্লেশ**—পাঁচ প্রকার জড় তাপ; **বিমোহ**—মোহমুক্ত; **সাধ্বসম্**—সংসার ভয়; **স্ব-দৃষ্ট-বদ্ভিঃ**—যাঁরা আত্ম-উপলব্ধি লাভ করেছেন তাঁদের দ্বারা; **পুরুষৈঃ**—পুরুষদের দ্বারা; **অভিষ্টুতম্**—উপাসিত।

## অনুবাদ

**ব্রহ্মার তপস্যায় অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে পরমেশ্বর ভগবান তাঁকে সমস্ত লোকের ঊর্ধ্বে তাঁর পরম ধাম বৈকুণ্ঠলোক প্রদর্শন করিয়েছিলেন। ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ধাম সবরকম জড় ক্লেশ এবং সংসার ভয় থেকে মুক্ত আত্মবিদ্‌দের দ্বারা পূজিত।**

## তাৎপর্য

ব্রহ্মা যে তপস্যার ক্লেশ স্বীকার করেছিলেন তা অবশ্যই ভক্তিযোগের পন্থা। তা না হলে তাঁর কাছে ভগবানের স্বধাম বা বৈকুণ্ঠলোক প্রকাশিত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। ভগবানের স্বীয় ধাম বৈকুণ্ঠ কাল্পনিক অথবা ভৌতিক নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা মনে করে। কিন্তু ভগবানের সেই অপ্রাকৃত ধাম কেবল ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই উপলব্ধি করা যায় এবং তাই ভগবদ্ভক্তরাই কেবল সেই ধামে প্রবেশ করতে পারেন। তপস্যা যে

ক্লেশকর সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু ভক্তিযোগ সাধনে যে কষ্ট স্বীকার করা হয় তা শুরু থেকেই দিব্য আনন্দ প্রদান করে। কিন্তু আত্ম-উপলব্ধির অন্যান্য পন্থায় (জ্ঞান যোগ, ধ্যানযোগ ইত্যাদি) যে তপস্যা করা হয় তা অত্যন্ত কষ্টকর এবং চরমেও কষ্ট ব্যতীত অন্য কিছু লাভ হয় না, বৈকুণ্ঠ উপলব্ধি তো দূরের কথা। তুষে আঘাত করে যেমন কখনো শস্য লাভ করা যায় না, তেমনই ভক্তিযোগ ব্যতীত আত্ম-উপলব্ধির অন্যান্য পন্থায় তপস্যার কষ্ট স্বীকার করার ফলে কোন লাভ হয় না।

ভক্তিযোগের অনুশীলন পরমেশ্বর ভগবানের নাভি থেকে উদ্ভূত অপ্রাকৃত পদ্মে উপবিষ্ট হওয়ার মতো, কেননা ব্রহ্মা সেখানে উপবিষ্ট। ব্রহ্মাজী ভগবানকে প্রসন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এবং ভগবানও ব্রহ্মাজীর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁকে স্বীয় ধাম প্রদর্শন করিয়েছিলেন। শ্রীল জীব গোস্বামী ক্রম-সন্দর্ভ নামক শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় বৈদিক প্রমান প্রদর্শন করে গর্গ-উপনিষদ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সেখানে বলা হয়েছে, যাজ্ঞবল্ক্য গার্গীকে ভগবানের অপ্রাকৃত ধাম বর্ণনা করে বলেছেন যে তা ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ লোক ব্রহ্মালোকেরও ঊর্ধ্বে অবস্থিত। ভগবানের এই ধাম যদিও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত প্রমুখ প্রামাণিক শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা হলেও তা অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন অল্পজ্ঞ মানুষদের কাছে রূপকথা বলে মনে হয়। এখানে *স্বদৃষ্টবদ্ভিঃ* শব্দটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। যিনি যথার্থই আত্ম-উপলব্ধি করেছেন, তিনি তাঁর দিব্য স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন। আত্মা অথবা পরমেশ্বরের নির্বিশেষ উপলব্ধি অপূর্ণ, কেননা তা জড় সবিশেষত্বের বিপরীত ধারণা। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ভক্তেরা অপ্রাকৃত ; তাঁদের কোন প্রাকৃত শরীর নেই। জড় শরীরে পাঁচ প্রকার ক্লেশের আবরণ থাকে, যথা অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ। জীব যতক্ষণ পর্যন্ত এই পাঁচ প্রকার জড় ক্লেশের দ্বারা অভিভূত থাকে, ততক্ষণ তার বৈকুণ্ঠ লোকে প্রবেশ করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। স্বরূপের নির্বিশেষ ধারণা জড় সবিশেষত্বের বিপরীত ধারণা, এবং তা প্রকৃত সবিশেষত্বের থেকে অনেক অনেক দূরে। ভগবদ্ধামের সবিশেষ রূপের কথা পরবর্তী শ্লোকসমূহে বিশ্লেষণ করা হবে। ব্রহ্মাজীও বৈকুণ্ঠলোকের সর্বোচ্চ লোককে গোলোক বৃন্দাবন বলে বর্ণনা করেছেন, সেখানে ভগবান এক গোপ বালকরূপে শত-সহস্র লক্ষ্মীদেবী কর্তৃক পরিবৃত হয়ে দিব্য সুরভী গাভীদের পালন করেন।

*চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ—*
*লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্।*
*লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রম সেব্যমানং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী, *যদগত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম,* এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। *পরম* মানে পরব্রহ্ম। তাই ভগবানের ধামও ব্রহ্ম, এবং তা পরমেশ্বর ভগবান

থেকে অভিন্ন। ভগবান বৈকুণ্ঠ নামে পরিচিত, এবং তাঁর ধামকেও বৈকুণ্ঠ বলা হয়। এই বৈকুণ্ঠ উপলব্ধি এবং পূজা কেবল অপ্রাকৃত রূপ এবং অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের দ্বারাই সম্ভব।

## শ্লোক ১০

**প্রবর্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ**
**সত্ত্বং চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।**
**ন যত্র মায়া কিমুতাপরে হরে—**
**রনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চিতাঃ ॥ ১০ ॥**

**প্রবর্ততে**—বিরাজ করে; **যত্র**—যেখানে; **রজঃ তমঃ**—রজ এবং তমোগুণ; **তয়োঃ**—তাদের উভয়ের; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণ; **চ**—এবং; **মিশ্রম্**—মিশ্রণ; **ন**—কখনোই না; **চ**—এবং; **কাল**—সময়; **বিক্রমঃ**—প্রভাব; **ন**—না; **যত্র**—সেখানে; **মায়া**—বহিরঙ্গা শক্তি; **কিম্**—কি; **উত**—সেখানে আছে; **অপরে**—অন্যেরা; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবানে; **অনুব্রতাঃ**—ভক্ত; **যত্র**—যেখানে; **সুর**—দেবতাদের দ্বারা; **অসুর**—অসুরদের দ্বারা; **অর্চিতাঃ**—পূজিত।

## অনুবাদ

**ভগবানের সেই ধামে রজো ও তমোগুণ নেই, এমনকি সেখানে সত্ত্বগুণেরও প্রভাব নেই। সেখানে বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাব তো দূরের কথা, কালেরও প্রভাব নেই। মায়া সেখানে প্রবেশ করতে পারে না। সুর এবং অসুর উভয়েই কোনরকম ভেদবুদ্ধি না করেই ভগবানের পূজা করেন।**

## তাৎপর্য

ভগবানের ধাম, বৈকুণ্ঠ জগৎ, *ত্রিপাদ-বিভূতি* নামে পরিচিত, এবং তা জড় জগৎ থেকে তিনগুণ বড়। সেই বৈকুণ্ঠ ধামের বর্ণনা এখানে এবং শ্রীমদ্ভগবদগীতাতেও সংক্ষেপে করা হয়েছে। কোটি কোটি গ্রহ-নক্ষত্র সমন্বিত এই ব্রহ্মাণ্ড মহত্তত্ত্বের অন্তর্গত অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডের একটি, এবং এই সমস্ত অগণিত ব্রহ্মাণ্ড একত্রে ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশ মাত্র। জড় আকাশের ঊর্ধ্বে চিদাকাশ রয়েছে এবং সেই চিদাকাশে বৈকুণ্ঠ নামক অপ্রাকৃত লোক রয়েছে, এবং তা হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির তিন-চতুর্থাংশ। ভগবানের সৃষ্টি সর্বদাই অন্তহীন। মানুষ একটি বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত গণনা করতে পারে না, অথবা তার নিজের মাথার চুল গণনা করতে পারে না। তাদের শরীরের একটি চুল পর্যন্ত সৃষ্টি করার ক্ষমতা না থাকলেও এই সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভগবান হওয়ার ধারণায় গর্বিত। মানুষ নানাবিধ আশ্চর্যজনক যানবাহন তৈরি করতে পারে, কিন্তু সে যদি তার বহু বিজ্ঞাপিত আকাশযানে চড়ে চন্দ্রলোকেও যায়, সে সেখানে থাকতে পারে না। তাই সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর হওয়ার গর্বে গর্বিত না হয়ে,

অপ্রাকৃত জগতের জ্ঞান লাভের সবচেয়ে সহজ পন্থা বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করেন। জড় আকাশের ঊর্ধ্বে যে অপ্রাকৃত জগৎ রয়েছে, তার প্রকৃতি এবং গঠন শ্রীমদ্ভাগবতের প্রামাণিকতার মাধ্যমে জানা উচিত। সেই আকাশে জড় গুণ, বিশেষ করে তমো এবং রজোগুণ, সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। রজোগুণের প্রভাবে জীব কাম ও লোভের বশবর্তী হয়, এবং বৈকুণ্ঠলোকে সেই গুণটি না থাকার ফলে সেখানকার জীবেরা এই দুটি প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রূপে মুক্ত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে ব্রহ্মভূত স্তরে জীব অনুশোচনা এবং আকাঙ্ক্ষা থেকে মুক্ত হয়। তাই সহজেই সিদ্ধান্ত করা যায় যে বৈকুণ্ঠলোকের সমস্ত অধিবাসীরা ব্রহ্মভূত স্তরে অধিষ্ঠিত, এবং তাঁরা জড় জগতের বদ্ধ জীবদের মতো অনুশোচনা ও আকাঙ্ক্ষার দ্বারা প্রভাবিত নন। কেউ যখন রজো এবং তমোগুণের অতীত হন, তখন অনুমান করা যায় যে তিনি জড় জগতে সত্ত্ব গুণে অধিষ্ঠিত। জড় জগতের এই সত্ত্বগুণও কিছু পরিমাণে রজো ও তমো গুণের দ্বারা মিশ্রিত। কিন্তু বৈকুণ্ঠলোকে যে গুণ তা হচ্ছে শুদ্ধ সত্ত্ব।

সেখানকার সমস্ত পরিস্থিতি বহিরঙ্গা শক্তির মোহময়ী সৃষ্টি থেকে মুক্ত। মায়া যদিও ভগবানেরই শক্তি, এই শক্তি ভগবান থেকে ভিন্ন। মায়া শক্তি কিন্তু মিথ্যা নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা দাবী করে থাকে। কোন বিশেষ ব্যক্তির কাছে একটি রজ্জু সর্প বলে মনে হতে পারে, কিন্তু রজ্জুটি বাস্তব এবং সর্পও বাস্তব। মরুভূমিতে তৃষ্ণার্ত একটি পশু উত্তপ্ত বালুকাকে জল বলে ভুল করতে পারে, কিন্তু মরুভূমি এবং জল উভয়ই বাস্তব। অতএব একজন অভক্তের কাছে ভগবানের জড় সৃষ্টি মোহময়ী বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একজন ভক্তের কাছে ভগবানের এই জড় সৃষ্টিও তাঁর বহিরঙ্গা শক্তিরূপে বাস্তব। কিন্তু ভগবানের এই শক্তিটি সবকিছু নয়। ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তিও রয়েছে, যা বৈকুণ্ঠলোক নামে পরিচিত, এবং সেই বৈকুণ্ঠে তমোগুণ নেই, রজো গুণ নেই, মোহ নেই এবং অতীত আদি কাল নেই। জ্ঞানের অল্পতাহেতু কেউ বৈকুণ্ঠ পরিবেশের অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে অক্ষম হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তা নেই। মানুষের অন্তরীক্ষ যান এই সমস্ত লোকে পৌঁছাতে পারে না বলে তার অর্থ এই নয় যে তাদের অস্তিত্ব নেই। প্রামাণিক শাস্ত্রে তাদের বর্ণনা পাওয়া যায়।

নারদ-পঞ্চরাত্র থেকে শ্রীল জীব গোস্বামীর উদ্ধৃতি বিশ্লেষণ করে আমরা জানতে পারি যে অপ্রাকৃত জগৎ বা বৈকুণ্ঠলোক অপ্রাকৃত গুণাবলীর দ্বারা গুণান্বিত। এই সমস্ত অপ্রাকৃত গুণ, ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমে যার প্রকাশ হয় তা জড় তমো, রজো এবং সত্ত্ব গুণ থেকে ভিন্ন। অভক্তরা কখনো এই সমস্ত গুণ লাভ করতে পারে না। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবানের সৃষ্টির এক-চতুর্থাংশের ঊর্ধ্বে রয়েছে তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশ। জড় জগৎ এবং চিজ্জগতের মধ্যবর্তী বিভাজক রেখা হচ্ছে বিরজা নদী, যা ভগবানের শরীরের স্বেদ-বারি থেকে উদ্ভূত। এই বিরজার পরপারে ভগবানের তিন-চতুর্থাংশ সৃষ্টি। ভগবানের সৃষ্টির সেই অংশটি নিত্য, শাশ্বত, অক্ষয় এবং অব্যয়, এবং সর্বোচ্চ স্তরের সিদ্ধ জীবেরা সেখানে বাস করেন। সাংখ্য-কৌমুদীতে

বর্ণনা করা হয়েছে যে শুদ্ধ সত্ত্ব বা অপ্রাকৃত তত্ত্ব জড়া প্রকৃতির গুণের সম্পূর্ণ বিপরীত। সেখানকার সমস্ত জীবেরা সেখানে নিরবচ্ছিন্নভাবে ভগবানের সঙ্গ লাভ করেন, এবং ভগবান হচ্ছেন প্রধান এবং পরম পুরুষ। আগম পুরাণেও সেই অপ্রাকৃত ধামের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে—ভগবানের পার্ষদেরা ভগবানের সৃষ্টির যে কোন স্থানে স্বাধীনভাবে বিচরণ করতে পারেন এবং ভগবানের সেই সৃষ্টি অন্তহীন, বিশেষ করে তাঁর তিন-চতুর্থাংশ সৃষ্টিতে। যেহেতু সেই স্থান অনন্ত, তাই তার কোন ইতিহাস নেই বা অন্ত নেই।

তাই সিদ্ধান্ত করা যায় যে যেহেতু সেখানে রজো এবং তমোগুণ সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত, তাই সেখানে সৃষ্টি এবং ধ্বংসের কোন প্রশ্ন উঠে না। জড় জগতে সবকিছুর সৃষ্টি হয়েছে এবং সবকিছুরই বিনাশ হয়, এবং সৃষ্টি ও বিনাশের মধ্যবর্তী জীবন ক্ষণস্থায়ী। চিন্ময় জগতে সৃষ্টি নেই এবং ধ্বংস নেই, এবং তাই সেখানকার জীবন নিত্য। অর্থাৎ চিজ্জগতে সবকিছুই নিত্য, পূর্ণজ্ঞানময় এবং অক্ষয় আনন্দময়। যেহেতু সেখানে ক্ষয় নেই, তাই সেখানে অতীত, ভবিষ্যৎ রূপ সময়ের প্রভাব নেই। এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে সেখানে কালের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অনুপস্থিত। সমগ্র জড় জগৎ ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার প্রভাব থেকে উদ্ভূত, যা অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ রূপে কালের প্রভাবের দ্বারা প্রভাবিত। সেখানে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বা কার্য-কারণের প্রভাব নেই। তাই সেখানে জন্ম, বৃদ্ধি, স্থিতি, রূপান্তর, ক্ষয় এবং প্রলয়—এই ছয়টি ভৌতিক পরিবর্তন নেই। তা হল জড় জগতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ভগবানের শক্তির বিশুদ্ধ প্রকাশ। বৈকুণ্ঠ লোকের সমগ্র অস্তিত্ব ঘোষণা করে যে সেখানকার প্রতিটি জীব ভগবানের অনুগত। সেখানে ভগবান হচ্ছেন প্রধান নায়ক। সেখানে নেতৃত্ব করার জন্য কেউ ভগবানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে না এবং সেখানে সকলেই ভগবানের অনুগত। তাই বেদে প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন প্রধান নায়ক এবং অন্য সমস্ত জীবেরা তাঁর অধীন, কেননা ভগবানই কেবল অন্য সমস্ত জীবের সমস্ত প্রয়োজন মেটাতে পারেন।

## শ্লোক ১১

**শ্যামাবদাতাঃ শতপত্রলোচনাঃ**
**পিশঙ্গ বস্ত্রাঃ সুরুচঃ সুপেশসঃ ।**
**সর্বে চতুর্বাহব উন্মিষন্মণি—**
**প্রবেকনিষ্কাভরণাঃ সুবর্চসঃ ॥ ১১ ॥**

শ্যাম—আকাশী নীল ; **অবদাতাঃ**—উজ্জ্বল ; **শতপত্র**—পদ্মফুল ; **লোচনাঃ**—নেত্র ; **পিশঙ্গ**—পীত বা হলুদ ; **বস্ত্রাঃ**—বস্ত্র ; **সুরুচঃ**—অত্যন্ত আকর্ষণীয় ;

**সুপেশসঃ**—সুকুমার ; **সর্বে**—তারা সকলে ; **চতুঃ**—চার ; **বাহবঃ**—হস্তযুক্ত ; **উন্মিষণ**—প্রভাযুক্ত ; **মণি**—মুক্তা ; **প্রবেক**—উত্তম ; **নিষ্ক-আভরণাঃ**—আলঙ্কারিক পদক ; **সুবর্চসঃ**—জ্যোতির্ময়।

## অনুবাদ

**বৈকুণ্ঠবাসীদের বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে তাঁরা সকলেই উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তাঁদের নয়ন পদ্ম ফুলের মতো, বসন পীতবর্ণ, অঙ্গ অতি কমনীয় ও সুকুমার ; তাঁরা সকলেই চতুর্ভুজ, অত্যন্ত প্রভাশালী, মণিখচিত পদকাভরণে সমলংকৃত ও অত্যন্ত তেজস্বী।**

## তাৎপর্য

বৈকুণ্ঠবাসীরা সকলেই চিন্ময় দেহ সমন্বিত, যা এই জড় জগতে দেখা যায় না। শ্রীমদ্ভাগবত আদি শাস্ত্রে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। শাস্ত্রে যে চিজ্জগতের নির্বিশেষ বর্ণনা দেখা যায়, তা ইঙ্গিত করে যে বৈকুণ্ঠলোকের রূপ এই ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও দেখা যায় না। কোন গ্রহের বিভিন্ন স্থানে যেমন দেহের গঠন বিভিন্ন প্রকার হয়, অথবা বিভিন্ন লোকের অধিবাসীদের দেহের গঠন যেমন ভিন্ন ভিন্ন হয়, তেমনই বৈকুণ্ঠ লোকের অধিবাসীদের দেহের গঠন জড় ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসীদের দেহের গঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যেমন, এই পৃথিবীর কোথাও চার হাতসম্পন্ন মানুষ দেখা যায় না।

## শ্লোক ১২

**প্রবালবৈদূর্যমৃণালবর্চসঃ**
**পরিস্ফুরৎকুণ্ডল মৌলিমালিনঃ ॥ ১২ ॥**

**প্রবাল**—প্রবাল ; **বৈদূর্য**—এক বিশেষ হীরা ; **মৃণাল**—স্বর্গীয় কমল ; **বর্চসঃ**—কিরণ ; **পরিস্ফুরৎ**—বিকশিত ; **কুণ্ডল**—কর্ণাভরণ ; **মৌলি**—মস্তক ; **মালিনঃ**—মাল্য বিভূষিত।

## অনুবাদ

**তাঁদের কারো অঙ্গকান্তি প্রবাল, বৈদূর্য ও মৃণালের মতো, এবং তাঁরা অতি দীপ্তিমান কুণ্ডল, মুকুট ও মাল্যসমূহে বিভূষিত।**

## তাৎপর্য

কোন কোন বৈকুণ্ঠবাসী স্বারূপ্য মুক্তি লাভ করেছেন, অর্থাৎ তাঁদের রূপ ঠিক পরমেশ্বর ভগবানের মতো। বৈদূর্য মণি বিশেষভাবে ভগবানের জন্য, কিন্তু যাঁরা ভগবানের মতো রূপ লাভ করেছেন তাঁরা এই প্রকার মণি ধারণ করার বিশেষ সৌভাগ্য লাভ করেন।

## শ্লোক ১৩

**ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিতো বিরাজতে**
**লসদ্বিমানা বলিভির্মহাত্মানাম্ ।**
**বিদ্যোতমানঃ প্রমদোত্তমাদ্যুভিঃ**
**সবিদ্যুদভ্রাবলিভির্যথা নভঃ ॥ ১৩ ॥**

**ভ্রাজিষ্ণুভিঃ**—দেদীপ্যমান ; **যঃ**—বৈকুণ্ঠলোক ; **পরিতঃ**—পরিবেষ্টিত ; **বিরাজতে**—এইভাবে অবস্থিত ; **লসৎ**—উজ্জ্বল ; **বিমান**—বিমান ; **অবলিভিঃ**—সমূহ ; **মহাত্মনাম্**—মহান ভগবদ্ভক্তদের ; **বিদ্যোতমানঃ**—বিদ্যুতের মতো সুন্দর ; **প্রমদ**—মহিলাগণ ; **উত্তম**—দিব্য ; **অদ্যুভিঃ**—কান্তিযুক্ত ; **সবিদ্যুৎ**—বিদ্যুৎসহ ; **অভ্রাবলিভিঃ**—মেঘমালা ; **যথা**—যেমন ; **নভঃ** —আকাশ ।

## অনুবাদ

**বিদ্যুৎশোভিত নিবিড় মেঘমালামণ্ডিত গগনমণ্ডল যেমন শোভাশালী, তেমনই সেই বৈকুণ্ঠধাম মহাত্মাদের দেদীপ্যমান বিমানশ্রেণী দ্বারা এবং সেখানকার রমণীদের বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল কান্তির দ্বারা শোভিত ।**

## তাৎপর্য

এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে বৈকুণ্ঠলোকে অতি উজ্জ্বল বিমানসমূহ রয়েছে, এবং ভগবানের মহান ভক্তেরা বিদ্যুতের মতো দ্যুতি সম্পন্ন তাঁদের সুন্দরী স্ত্রীদের নিয়ে সেই বিমানে ভ্রমণ করেন। সেখানে যেমন বিমান রয়েছে, তেমনই অন্যান্য যানও নিশ্চয়ই সেখানে রয়েছে, তবে সেগুলি এই পৃথিবীর যানবাহনের মতো যন্ত্রচালিত নয়। যেহেতু সেখানে সবকিছুই সৎ, চিৎ এবং আনন্দময়, সেখানকার বিমান এবং অন্যান্য যানবাহনও ব্রহ্মভূত। যদিও সেখানে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছু নেই, তা বলে কারোরই ভ্রান্তভাবে ধারণা করা উচিত নয় যে সেই জগৎ শূন্য এবং বৈচিত্র্যহীন। যথার্থ জ্ঞানের অভাবে মানুষ সেইভাবে চিন্তা করে ; তা না হলে কেউই ব্রহ্মকে শূন্য বলে ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত না। সেখানে যেহেতু বিমান, রমণী এবং পুরুষেরা রয়েছে, তাই সেই লোকের উপযুক্ত বাড়ি, ঘর, শহর ও নিশ্চয়ই রয়েছে। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে সেখানকার পরিবেশ কাল ইত্যাদির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, সেকথা বিবেচনা না করে এই জগতের অপূর্ণতার ভিত্তিতে সেই জগতের অনুমান করা উচিত নয়।

## শ্লোক ১৪

**শ্রীর্যত্র রূপিণ্যুরুগায়পাদয়োঃ**
**করোতি মানং বহুধা বিভূতিভিঃ ।**

প্রেঙ্খং শ্রিতা যা কুসুমাকরানুগৈ
বিগীয়মানা প্রিয়কর্ম গায়তী ॥ ১৪ ॥

**শ্রীঃ**—লক্ষ্মী ; **যত্র**—বৈকুণ্ঠলোকে ; **রূপিণী**—তাঁর দিব্য রূপে ; **উরুগায়**—ভগবান, মহান ভক্তরা যাঁর মহিমা গান করেন ; **পাদয়োঃ**—ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে ; **করোতি**—করেন ; **মানম্**—শ্রদ্ধাযুক্ত সেবা ; **বহুধা**—বিবিধ সামগ্রীর দ্বারা ; **বিভূতিভিঃ**—তাঁর পার্ষদগণসহ ; **প্রেঙ্খম্**—আনন্দপূর্বক বিচরণ ; **শ্রিতা**—শরণাগত ; **যা**—যিনি ; **কুসুমাকর**—বসন্ত ; **অনুগৈঃ**—ভ্রমরদের দ্বারা ; **বিগীয়মানা**—অনুগীত ; **প্রিয়কর্ম**—প্রিয়তমের কার্যকলাপ ; **গায়তী**—গান করেন।

## অনুবাদ

**দিব্য রূপ সমন্বিত লক্ষ্মীদেবী তাঁর সহচরী বিভূতিগণ সহ ভগবানের শ্রীপাদপদ্মের প্রেমময়ী সেবা করেন। সেই লক্ষ্মীদেবী আনন্দভরে আন্দোলিতা এবং বসন্তের অনুচর ভ্রমরগণ কর্তৃক অনুগীত হয়ে তাঁর প্রিয়তম ভগবানের মহিমা গান করেন।**

## শ্লোক ১৫

দদর্শ তত্রাখিলসাত্বতাং পতিং
শ্রিয়ঃ পতিং যজ্ঞপতিং জগৎপতিম্ ।
সুনন্দ নন্দ প্রবলার্হণাদিভিঃ
স্বপার্ষদাগ্রৈঃ পরিসেবিতং বিভুম্ ॥ ১৫ ॥

**দদর্শ**—ব্রহ্মা দেখলেন ; **তত্র**—সেখানে (বৈকুণ্ঠ লোকে) ; **অখিল**—সমগ্র ; **সাত্বতাম্**—মহান্ ভক্তদের ; **পতিম্**—ঈশ্বর ; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর ; **পতিম্**—পতি ; **যজ্ঞ**—যজ্ঞের ; **পতিম্**—পতি ; **জগৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের ; **পতিম্**—পতি ; **সুনন্দ**—সুনন্দ ; **নন্দ**—নন্দ ; **প্রবল**—প্রবল ; **অর্হণ**—অর্হণ ; **আদিভিঃ**—তাদের দ্বারা ; **স্বপার্ষদ**—স্বীয় পার্ষদগণ ; **অগ্রৈঃ**—মুখ্য ; **পরিসেবিতম্**—অপ্রাকৃত প্রেমপূর্বক সেবিত ; **বিভুম্**—সর্বশক্তিমান।

## অনুবাদ

**ব্রহ্মা দেখলেন যে সেই বৈকুণ্ঠে ভক্তদের প্রভু, যজ্ঞপতি, জগৎপতি, লক্ষ্মীপতি সর্বশক্তিমান ভগবান সেখানে সুনন্দ, নন্দ, প্রবল, অর্হণ প্রভৃতি পার্ষদদের দ্বারা পরিবেষ্টিত ও প্রেমপূর্বক সেবিত হয়ে বিরাজ করছেন।**

## তাৎপর্য

আমরা যখন কোন রাজার কথা বলি তখন স্বাভাবিকভাবেই বুঝতে পারি, সেই রাজা তাঁর সচিব, ব্যক্তিগত সহকারী, মন্ত্রী, উপদেষ্টা ইত্যাদি বিশ্বস্ত পার্ষদগণ কর্তৃক

পরিবেষ্টিত। তেমনই আমরা যখন ভগবানকে দর্শন করি তখন দেখতে পাই যে তিনি তাঁর বিভিন্ন শক্তি, পার্ষদ, বিশ্বস্ত সেবক আদি সহ বিরাজমান। তাই পরমেশ্বর ভগবান, যিনি সমস্ত জীবের পতি, সমস্ত ভক্তদের ঈশ্বর, সমগ্র ঐশ্বর্যের অধিপতি, সমগ্র যজ্ঞের পতি এবং তাঁর সৃষ্টির সব কিছুর অধীশ্বর, তিনি কেবল পরম পুরুষই নন, তিনি সর্বদা তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদ কর্তৃক পরিবেষ্টিত, এবং তাঁরা সকলে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত।

## শ্লোক ১৬

**ভৃত্যপ্রসাদাভিমুখং দৃগাসবং**
**প্রসন্নহাসারুণলোচনাননম্।**
**কিরীটিনং কুণ্ডলিনং চতুর্ভুজং**
**পীতাংশুকং বক্ষসি লক্ষিতং শ্রিয়া ॥ ১৬ ॥**

**ভৃত্য**—সেবক; **প্রসাদ**—স্নেহ; **অভিমুখম্**—উদ্‌গ্রীব; **দৃক্**—দৃশ্য; **আসবম্**—মাদক; **প্রসন্ন**—অত্যন্ত প্রীত; **হাস**—হাস্য; **অরুণ**—রক্তিম; **লোচন**—নেত্র; **আননম্**—মুখ; **কিরীটিনম্**—মুকুটসহ; **কুণ্ডলিনম্**—কুণ্ডলসহ; **চতুর্ভুজম্**—চতুর্ভুজ; **পীত**—হলুদ; **অংশুকম্**—বসন; **বক্ষসি**—বক্ষে; **লক্ষিতম্**—অঙ্কিত; **শ্রিয়া**—লক্ষ্মীদেবীর দ্বারা।

## অনুবাদ

**পরমেশ্বর ভগবান সেখানে তাঁর ভৃত্যদের প্রসাদ বিতরণের জন্য উদগ্রীব। তাঁর মাদকতাপূর্ণ আকর্ষণীয় রূপ অত্যন্ত প্রসন্নতাময়। তাঁর হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল অরুণ নয়ন শোভিত, তাঁর মস্তক কিরীটশোভিত, কর্ণে কুণ্ডল, তিনি চতুর্ভুজ এবং তাঁর বক্ষঃস্থল শ্রীচিহ্ন ভূষিত।**

## তাৎপর্য

পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ভগবান যেখানে তাঁর ভক্তদের দর্শন দান করেন সেই যোগপীঠের পূর্ণ বর্ণনা রয়েছে। সেই যোগপীঠে মূর্তিমান ধর্ম, জ্ঞান, ঐশ্বর্য, বৈরাগ্য প্রভৃতি ভগবানের চরণ কমলে আসীন। চতুর্বেদ—ঋক, সাম, যজুঃ এবং অথর্ব, সেখানে ভগবানকে উপদেশ দেওয়ার জন্য সর্বদা উপস্থিত। চণ্ড প্রমুখ ষোড়শ শক্তি সেখানে বর্তমান। চণ্ড এবং কুমুদ হচ্ছেন প্রথম দুই দ্বাররক্ষী। মধ্য দ্বারে দ্বারীগণ হচ্ছেন ভদ্র এবং সুভদ্র, এবং শেষ দ্বারে রয়েছেন জয় এবং বিজয়। সেখানে কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ ইত্যাদি অন্যান্য দ্বাররক্ষীগণও রয়েছেন। ভগবানের প্রাসাদ উপরোক্ত দ্বাররক্ষকগণ কর্তৃক অলঙ্কৃত এবং রক্ষিত।

## শ্লোক ১৭

**অধ্যর্হণীয়াসনমাস্থিতং পরং**
**বৃতং চতুঃষোড়শপঞ্চশক্তিভিঃ।**
**যুক্তং ভগৈঃ স্বৈরিতরত্র চাধ্রুবৈঃ**
**স্ব এব ধামন্ রমমাণমীশ্বরম্ ॥ ১৭ ॥**

**অধ্যর্হনীয়**—পরম পূজ্য ; **আসনম্**—সিংহাসন ; **আস্থিতম্**—উপবিষ্ট ; **পরম্**—পরম ; **বৃতম্**—পরিবেষ্টিত ; **চতুঃ**—চার, যথা প্রকৃতি, পুরুষ, মহৎ এবং অহংকার ; **ষোড়শ**—ষোল ; **পঞ্চ**—পাঁচ ; **শক্তিভিঃ**—শক্তির দ্বারা ; **যুক্তম্**—যুক্ত ; **ভগৈঃ**—তাঁর ঐশ্বর্য ; **স্বৈঃ**—স্বীয় ; **ইতরত্র**—অন্যান্য গৌণ শক্তিসমূহের দ্বারা ; **চ**—ও ; **অধ্রুবৈঃ**—অনিত্য ; **স্বে**—স্বীয় ; **এব**—অবশ্যই ; **ধামন্**—ধাম ; **রম্যমাণম্**—উপভোগ করে ; **ঈশ্বরম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

### অনুবাদ

**সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রেষ্ঠ সিংহাসনে উপবিষ্ট, এবং তিনি চতুঃ, ষোড়শ ও পঞ্চ শক্তির দ্বারা পরিবেষ্টিত, এবং অন্যান্য গৌণ শক্তিসহ ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। তিনি তাঁর স্বীয় ধামে রম্যমাণ প্রকৃত পরমেশ্বর ভগবান**

### তাৎপর্য

ভগবান স্বাভাবিক ভাবেই ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ। বিশেষ করে তিনি সব চেয়ে সম্পদশালী, সর্বশক্তিমান, সর্বাধিক যশস্বী, সর্বাপেক্ষা সুন্দর, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী এবং সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যাগী। জড় সৃষ্টির জন্য তিনি প্রকৃতি, পুরুষ, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার এই চারটি শক্তির দ্বারা সেবিত। তিনি পঞ্চ মহাভূত (ভূমি, জল, আগুন, বায়ু এবং আকাশ), পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় (চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বক), এবং পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় (হস্ত, পদ, উদর, পায়ু এবং উপস্থ) এবং মন, এই ষোলটি শক্তির দ্বারাও সেবিত। অন্য পঞ্চশক্তি হচ্ছে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ এবং স্পর্শ, এই পাঁচটি তন্মাত্র। এই পঞ্চ বিংশতি উপকরণ জড় সৃষ্টির ব্যাপারে ভগবানকে সেবা করেন, এবং তাঁরা সকলে সেখানে উপস্থিত। আটটি নগণ্য ঐশ্বর্যও (অষ্ট সিদ্ধি, যা যোগীরা তাদের অনিত্য প্রভাব বিস্তারের জন্য কামনা করে) তাঁর অধীন। কিন্তু তিনি স্বাভাবিকভাবেই অনায়াসে এই সমস্ত শক্তিসমন্বিত, এবং তাই তিনি হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান।

জীব কঠোর তপস্যা অথবা যোগ ব্যায়ামের দ্বারা সাময়িকভাবে কোন কোন আশ্চর্য শক্তি লাভ করতে পারে, কিন্তু তা বলে তারা ভগবান হয়ে যায় না। পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবেই যে কোন যোগীর থেকে অসংখ্য গুণ অধিক শক্তিশালী; তিনি যে কোন জ্ঞানীর থেকে অসংখ্য গুণ অধিক জ্ঞানী, তিনি যে কোন ধনী ব্যক্তির থেকে

অসংখ্য গুণ ধনী, তিনি যে কোন সুন্দর ব্যক্তির থেকে অসংখ্য গুণ অধিক সুন্দর এবং তিনি যে কোন দানীর থেকে অসংখ্য গুণ অধিক দানী। সর্বোপরি কেউই তাঁর সমকক্ষ নয় অথবা তাঁর থেকে মহৎ নয়। কেউই কোনরকম তপস্যা বা যোগ অভ্যাসের দ্বারা সিদ্ধিলাভপূর্বক তাঁর মতো পূর্ণতার স্তরে পৌঁছাতে পারে না। যোগীরা তাঁর কৃপার উপর নির্ভরশীল। তাঁর অসীম দানশীলতার জন্য তিনি যোগীদের সাময়িকভাবে কোনও শক্তি দান করেন, কেননা যোগীরা সেই সমস্ত শক্তির আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু তাঁর অনন্য ভক্তদের, যাঁরা তাঁর প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করেন না, তাঁদের প্রতি তিনিএতই প্রসন্ন হন যে, তাঁদের অহৈতুকী সেবার বিনিময়ে তাঁদের কাছে নিজেকে দান করেন।

## শ্লোক ১৮

**তদ্দর্শনাহ্লাদপরিপ্লুতান্তরো**
**হৃষ্যত্তনুঃ প্রেমভরাশ্রুলোচনঃ ।**
**ননাম পাদাম্বুজমস্য বিশ্বসৃগ**
**যৎপারমহংস্যেন পথাধিগম্যতে ॥ ১৮ ॥**

**তৎ**—তাঁর ; **দর্শন**—দর্শন ; **পরিপ্লুত**—আনন্দ ; **আহ্লাদ**—বিহ্বল ; **অন্তরঃ**—হৃদয়ে ; **হৃষ্যৎ**—আনন্দে পূর্ণ ; **তনুঃ**—দেহ ; **প্রেম-ভর**—অপ্রাকৃত প্রেমে পূর্ণ ; **অশ্রু**—অশ্রু ; **লোচনঃ**—নয়ন ; **ননাম**—প্রণত ; **পাদাম্বুজম্**—তাঁর শ্রীপাদপদ্মে ; **অসৎ**—ভগবানের ; **বিশ্বসৃগ্**—সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ; **যৎ**—যা ; **পারমহংস্যেন**—পরম মুক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ; **পথা**—পথ ; **অধিগম্যতে**—অনুসরণ করা হয়।

## অনুবাদ

**এইভাবে পূর্ণরূপে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করে ব্রহ্মা অন্তরে আনন্দ বিহ্বল হলেন এবং দিব্য প্রেম ও আনন্দে তাঁর নেত্র প্রেমাশ্রুতে পূর্ণ হল। তিনি তখন ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে প্রণত হলেন। পরমহংসদের মার্গ অনুসরণ করলেই কেবল এই পরম সিদ্ধি লাভ হয়।**

## তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে যে এই মহান শাস্ত্রটি পরমহংসদের জন্য। *পরমো নির্মৎসরাণাং সতাম্*, অর্থাৎ যাঁরা সমস্ত কলুষ থেকে সর্বতোভাবে মুক্ত হয়েছেন, এই শ্রীমদ্ভাগবত কেবল তাঁদেরই জন্য। বদ্ধ জীবন শুরু হয় সর্বোচ্চ ঈর্ষার ফলে, অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি মৎসরতা পোষণ করার ফলে। সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানকে বাস্তব সত্য বলে স্বীকার করা হয়েছে, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ রূপ বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে এবং সেই মহান শাস্ত্রের শেষ অংশে জড় জগতের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য সেই পরমেশ্বর

ভগবানের শরণাগত হওয়ার বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত পুণ্যহীন ব্যক্তিরা পরমেশ্বর ভগবানে বিশ্বাস করে না, পক্ষান্তরে তারা ভগবান হতে চায়। বদ্ধ জীবের এই মৎসরতার পরম প্রকাশ হচ্ছে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা, এবং তাই সর্ব শ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরাও পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা করার ফলে, মাৎসর্যপূর্ণ মনোভাবের ফলে কখনো *পরমহংস* হতে পারে না। যাঁরা ভক্তিযোগের অনুশীলনে ঐকান্তিকভাবে যুক্ত, তাঁরাই কেবল *পরমহংস* স্তর লাভ করতে পারেন। ভক্তিযোগের শুরু হয় যখন মানুষ গভীর নিষ্ঠা সহকারে বিশ্বাস করে যে পূর্ণ প্রেমে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলেই কেবল জীবনের সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করা যায়। ব্রহ্মাজী ভক্তিযোগের এই পন্থায় বিশ্বাসী হয়েছিলেন। তিনি তপস্যা করার জন্য ভগবানের নির্দেশে বিশ্বাসপরায়ণ হয়েছিলেন এবং কঠোর তপস্যা করার ফলে বৈকুণ্ঠলোক এবং ভগবানকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করার মহান সাফল্য অর্জন করেছিলেন। কোন যান্ত্রিক উপায়ে অথবা মানসিক চেষ্টার দ্বারা পরমেশ্বর ভগবানের অপ্রাকৃত ধামে যাওয়া যায় না, কিন্তু কেবল ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার ফলে সেই বৈকুণ্ঠলোকে যাওয়া যায়; কেননা ভক্তিযোগের মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে উপলব্ধি করা যায়। ব্রহ্মাজী প্রকৃতপক্ষে তাঁর কমলাসনে উপবিষ্ট ছিলেন, কিন্তু গভীর ঐকান্তিকতা সহকারে ভক্তিযোগের পন্থা অনুশীলন করার ফলে সেখান থেকে তিনি পরম বৈচিত্র্যপূর্ণ বৈকুণ্ঠলোক এবং স্বপার্ষদ ভগবানকে দর্শন করেছিলেন।

ব্রহ্মার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এখনও যে কোন ব্যক্তি সেই সিদ্ধি লাভ করতে পারেন, এবং এই পন্থাকে বলা হয় *পরমহংস* পন্থা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও আধুনিক যুগের মানুষদের আত্ম-উপলব্ধির জন্য এই পন্থা অনুমোদন করেছেন। সর্বপ্রথমে সর্বতোভাবে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণে বিশ্বাস করতে হবে এবং মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানবার চেষ্টা না করে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং তারপর শ্রীমদ্ভাগবত থেকে তাঁর সম্বন্ধে শ্রবণ করতে হবে। আর পেশাদারী ব্যক্তিদের কাছ থেকে, অর্থাৎ কর্মী, জ্ঞানী অথবা যোগীদের কাছ থেকে না শুনে ভক্ত-ভাগবতের কাছ থেকে ভগবানের কথা শুনতে হবে। এই বিজ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করার এটিই হচ্ছে রহস্য। সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করার প্রয়োজন নেই; পক্ষান্তরে যে অবস্থায় মানুষ রয়েছে, সেই অবস্থায় থেকেই ভগবানের যথার্থ ভক্তের সান্নিধ্যে পূর্ণ বিশ্বাস সহকারে ভগবানের অপ্রাকৃত বাণী শ্রবণ করতে হবে। এটিই হচ্ছে *পরমহংস* পন্থা, যা এখানে অনুমোদন করা হয়েছে। ভগবানের অসংখ্য দিব্য নামের মধ্যে একটি হচ্ছে *অজিত*, অর্থাৎ কেউই কখনো তাঁকে জয় করতে পারে না। তথাপি তিনি *পরমহংস* পন্থায় জিত হন, যা মহান গুরু ব্রহ্মা স্বয়ং উপলব্ধি করার মাধ্যমে প্রদর্শন করেছেন। ব্রহ্মা স্বয়ং এই *পরমহংস* পন্থার বর্ণনা করে বলেছেন—

*জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাস্য নমন্ত এব*
*জীবন্তি সন্মুখরিতাং ভবদীয় বার্তাম্।*

*স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাং তনুবাঙমনোভি—*
*র্যে প্রায়শোঽজিত জিতোঽপ্যাসিতৈস্ত্রিলোক্যাম্ ॥*

ব্রহ্মা বলেছেন, "হে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, যে ভক্ত ব্রহ্মে লীন হওয়ার জ্ঞানের পন্থা পরিত্যাগ করে সাধুদের কাছে তোমার মহিমা এবং কার্যকলাপ কায়মনোবাক্যে শ্রবণ করেন, এবং শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে জীবন যাপন করেন, তিনি তোমার সহানুভূতি এবং করুণা জয় করতে পারেন, যদিও তুমি অজিত।" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০/১৪/৩) এটিই হচ্ছে *পরমহংস* পন্থা, যা ব্রহ্মা স্বয়ং অনুসরণ করেছিলেন এবং পরে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের জন্য অনুমোদন করেছেন।

## শ্লোক ১৯

**তং প্রীয়মাণং সমুপস্থিতং কবিং**
**প্রজাবিসর্গে নিজশাসনার্হণম্।**
**বভাষ ঈষৎস্মিতশোচিষা গিরা**
**প্রিয়ঃ প্রিয়ং প্রীতমনাঃ করে স্পৃশন্ ॥ ১৯ ॥**

**তম্**—ব্রহ্মাকে; **প্রীয়মাণম্**—প্রিয়পাত্র; **সমুপস্থিতম্**—সম্মুখে উপস্থিত; **কবিম্**—মহাবিদ্বান; **প্রজা**—জীব; **বিসর্গে**—সৃষ্টিকার্যে; **নিজ**—তাঁর নিজের; **শাসন**—নিয়ন্ত্রণ; **অর্হণম্**—উপযুক্ত; **বভাষে**—সম্বোধন করেছিলেন; **ঈষৎ**—মৃদু; **স্মিত**—হাস্য; **শোচিষা**—শোভাযুক্ত; **গিরা**—বাণী; **প্রিয়ঃ**—প্রিয়; **প্রিয়ম্**—প্রেমাস্পদ; **প্রীতমনাঃ**—অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে; **করে**—হস্ত দ্বারা; **স্পৃশন্**—স্পর্শ করে।

## অনুবাদ

**তখন প্রেমবশ ভগবান সন্তুষ্ট চিত্তে উপদেশ প্রদানের যোগ্য পাত্র ব্রহ্মার প্রতি অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হয়ে তাঁর হাত ধরে ঈষৎ রুচির হাস্য সহকারে সুমধুর সম্ভাষণে বলতে শুরু করলেন।**

## তাৎপর্য

জড় জগতের সৃষ্টি অন্ধ নয় অথবা আকস্মিক নয়। ভগবান ব্রহ্মা প্রমুখ তাঁর প্রতিনিধিদের তত্ত্বাবধানে নিত্যবদ্ধ জীবদের মুক্তির জন্য এই ব্যবস্থা করেছেন। বদ্ধ জীবদের এই জ্ঞান প্রদান করার জন্য ভগবান ব্রহ্মাকে বৈদিক জ্ঞান দান করেছেন। বদ্ধ জীবেরা ভগবানের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের কথা ভুলে গেছে, এবং তাই এইভাবে জড় জগৎ সৃষ্টি করার মাধ্যমে বৈদিক জ্ঞান প্রদান করার প্রয়োজন হয়েছে। বদ্ধ জীবদের উদ্ধার করার মহান দায়িত্ব ব্রহ্মার রয়েছে, এবং তাই তিনি ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়।

ব্রহ্মা তাঁর কর্তব্য অত্যন্ত নিপুণতা সহকারে সম্পাদন করেন, কেবল জীব সৃষ্টি করেই নয়, উপরন্তু অধঃপতিত জীবদের উদ্ধার করার জন্য তাঁর অনুগামীদের চতুর্দিকে প্রেরণ

করার মাধ্যমে। তাঁর গোষ্ঠীকে বলা হয় ব্রহ্ম-সম্প্রদায়, এবং আজও এই সম্প্রদায়ের সদস্যরা ভগবদ্ধামে বদ্ধ জীবদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যে স্বাভাবিকভাবে লিপ্ত। ভগবান তাঁর বিভিন্ন অংশদের তাঁর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অত্যন্ত উৎসুক, যে কথা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে। তাই যাঁরা বদ্ধ জীবদের ভগবানের কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কার্যে লিপ্ত, তাঁরা ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে কিছু দলত্যাগী রয়েছে যাদের একমাত্র কার্য হচ্ছে মানুষদের ভগবানের কথা বিস্মৃত করে জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ করা। এই প্রকার ব্যক্তিরা কখনো ভগবানের প্রিয় নয় এবং ভগবান তাদের গভীর অন্ধকার প্রদেশে নিক্ষেপ করেন, যাতে সেই ঈর্ষাপরায়ণ অসুরেরা পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে না পারে। কিন্তু যাঁরা ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ে ভগবানের শিক্ষা প্রচার করেন, তাঁরা সর্বদাই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয় এবং ভগবান প্রামাণিক ভক্তিমার্গের সেই সমস্ত প্রচারকদের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে তাঁদের হস্ত ধারণপূর্বক তাঁর প্রসন্নতা প্রকাশ করেন।

## শ্লোক ২০

### শ্রীভগবানুবাচ

**ত্বয়াহং তোষিতঃ সম্যগ্বেদগর্ভ সিসৃক্ষয়া।**
**চিরং ভৃতেন তপসা দুস্তোষঃ কূটযোগিনাম্ ॥ ২০ ॥**

**শ্রীভগবান্ উবাচ**—সর্বসৌন্দর্যমণ্ডিত পরমেশ্বর ভগবান বললেন; **ত্বয়া**—তোমার দ্বারা; **অহম্**—আমি; **তোষিতঃ**—প্রসন্ন; **সম্যক্**—পূর্ণ রূপে; **বেদগর্ভ**—বৈদিক জ্ঞান সমন্বিত; **সিসৃক্ষয়া**—সৃষ্টির জন্য; **চিরম্**—দীর্ঘকাল; **ভৃতেন**—সঞ্চিত; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা; **দুস্তোষঃ**—যাঁকে সন্তুষ্ট করা অত্যন্ত কঠিন; **কূটযোগিনাম্**—কপট যোগীদের দ্বারা।

### অনুবাদ

**পরম সুন্দর পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাকে বললেন—হে বেদগর্ভ ব্রহ্মা! সৃষ্টির বাসনায় তুমি যে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছ, তার ফলে আমি তোমার প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছি। কপট যোগীরা কখনো আমার সন্তুষ্টি বিধান করতে পারে না।**

### তাৎপর্য

দুই প্রকার তপস্যা রয়েছে—একটি ইন্দ্রিয় তৃপ্তি সাধনের জন্য এবং অপরটি আত্ম তত্ত্ব উপলব্ধির জন্য। বহু কপট যোগী রয়েছে যারা তাদের নিজেদের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কঠোর তপস্যা করে, আর অন্য অনেকে রয়েছে যারা ভগবানের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য কঠোর তপস্যা করে। যেমন, আণবিক অস্ত্র আবিষ্কারের জন্য যে তপস্যা করা হয়, তা কখনো ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে না, কেননা এই প্রকার তপস্যা সন্তুষ্টিজনক নয়।

প্রকৃতির নিয়মে যথাসময়ে সকলেরই মৃত্যু হবে, কিন্তু মৃত্যুর সেই প্রক্রিয়া শীঘ্রকরণের জন্য যদি কেউ তপস্যা করে, তা হলে তা ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করে না।

ভগবান চান তাঁর বিভিন্নাংশ জীবসমূহ যেন নিত্য জীবন লাভ করে নিত্য আনন্দ আস্বাদনের জন্য তাঁর কাছে ফিরে যায়। জড় সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে তাই। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য, অর্থাৎ সৃষ্টির প্রক্রিয়া সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য ব্রহ্মা কঠোর তপস্যা করেছিলেন, এবং তাই ভগবান তাঁর প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়েছিলেন। তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে ভগবান তাঁর হৃদয়ে বৈদিক জ্ঞান সঞ্চার করেছিলেন। বৈদিক জ্ঞানের চরম উদ্দেশ্য হচ্ছে ভগবানকে জানা। অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করা উচিত নয়। সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যারা বৈদিক জ্ঞানের সদ্ব্যবহার করে না, তাদের বলা হয় *কূটযোগী* বা কপট যোগী, যারা অসৎ উদ্দেশ্যে তাদের জীবন নষ্ট করে।

## শ্লোক ২১

**বরং বরয় ভদ্রং তে বরেশং মাভিবাঞ্ছিতম্।**
**ব্রহ্মঞ্ছ্রেয়ঃ পরিশ্রামঃ পুংসাং মদ্দর্শনাবধিঃ ॥ ২১ ॥**

**বরম্**—বর ; **বরয়**—আমার কাছে ভিক্ষা কর ; **ভদ্রম্**—মঙ্গলময় ; **তে**—তোমাকে ; **বর-ঈশম্**—সমস্ত বর প্রদানকারী ; **মা** (**মাম্**)—আমার থেকে ; **অভিবাঞ্ছিতম্**— অভিলষিত ; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রহ্মা ; **শ্রেয়ঃ**—শ্রেয় ; **পরিশ্রামঃ**—সমস্ত তপস্যার জন্য ; **পুংসাম্**—সকলের জন্য ; **মৎ**—আমার ; **দর্শন**—দর্শন ; **অবধিঃ**—চরম সীমা।

## অনুবাদ

**হে ব্রহ্মা ! তোমার মঙ্গল হোক, তুমি আমার কাছে অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। কেননা আমিই একমাত্র বর প্রদানের কর্তা। শ্রেয় লাভের জন্য সকলে যে পরিশ্রম করে, আমার দর্শনই তার চরম ফল।**

## তাৎপর্য

পরম তত্ত্বের চরম উপলব্ধি হচ্ছে সাক্ষাৎভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে জানা এবং দর্শন করা। নির্বিশেষ ব্রহ্ম এবং অন্তর্যামী পরমাত্মা উপলব্ধি ভগবদুপলব্ধির চরম অবস্থা নয়। পরমেশ্বর ভগবানকে জানার জন্য এই প্রকার কঠোর তপস্যা করতে হয় না। তখন কেবল পরমেশ্বর ভগবানের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করতে হয়। অর্থাৎ যিনি পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করেছেন এবং দর্শন করেছেন, তিনি সর্বসিদ্ধি লাভ করেছেন, কেননা সেই পরম সিদ্ধিতে সবকিছুই অন্তর্ভুক্ত। নির্বিশেষবাদী এবং কপট যোগীরা কিন্তু কখনো এই স্তর প্রাপ্ত হতে পারে না।

## শ্লোক ২২

**মনীষিতানুভাবোঽয়ং মম লোকাবলোকনম্ ।
যদুপশ্রুত্য রহসি চকর্থ পরমং তপঃ ॥ ২২ ॥**

**মনীষিত**—দক্ষতা ; **অনুভাবঃ**—উপলব্ধি ; **অয়ম্**—এই ; **মম**—আমার ; **লোক**—ধাম ; **অবলোকনম্**—প্রকৃত অভিজ্ঞতার মাধ্যমে দর্শন করা ; **যৎ**—যেহেতু ; **উপশ্রুত্য**—শ্রবণ করে ; **রহসি**—গভীর তপস্যায় ; **চকর্থ**—অনুষ্ঠান করে ; **পরমম্**—সর্বোচ্চ ; **তপঃ**—তপস্যা ।

## অনুবাদ

**সর্বশ্রেষ্ঠ এবং পূর্ণতম দক্ষতা হচ্ছে আমার ধাম ব্যক্তিগতভাবে দর্শন করা, এবং তোমার পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে কেননা আমার নির্দেশ অনুসারে তুমি শ্রদ্ধা সহকারে কঠোর তপস্যা করেছ ।**

## তাৎপর্য

জীবনের পরম সিদ্ধি হচ্ছে ভগবানের কৃপায় প্রত্যক্ষ দর্শন মাধ্যমে ভগবানকে জানা । তা তাদেরই পক্ষে সম্ভব যারা শাস্ত্রের বাণী এবং সদ্‌গুরুর স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসারে ভক্তির পন্থা অনুশীলনে ইচ্ছুক । যেমন, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্র যা শঙ্করাচার্য, রামানুজ, মধ্ব, শ্রীচৈতন্য, বিশ্বনাথ, বলদেব, সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রমুখ বহু আচার্য কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ দিয়েছেন সকলেই যেন তাদের মনের দ্বারা তাঁর কথা চিন্তা করে, তাঁর ভক্ত হয়, তাঁর পূজা করে এবং তাঁকে প্রণতি নিবেদন করে, এবং তা করার ফলে তারা তাদের নিত্য আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে ;সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই ।

অন্যত্র তিনি সেই নির্দেশেরই পুনরাবৃত্তি করে বলেছেন সমস্ত তথাকথিত ধর্ম পরিত্যাগ করে সকলেই যেন পূর্ণরূপে তাঁর শরণাগত হয়, এবং তা হলে তিনি তাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করবেন । সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভের এটিই হচ্ছে রহস্য ।

ব্রহ্মা সর্বপ্রকার অহঙ্কার পরিত্যাগ করে যথাযথভাবে এই নির্দেশ অনুসরণ করেছিলেন এবং তার ফলে তিনি পরমেশ্বর ভগবানকে তাঁর ধাম এবং পরিকরসহ দর্শন করার পরম সিদ্ধি লাভ করেছিলেন ।

ভগবানের দেহনির্গত জ্যোতির নির্বিশেষ দর্শন সর্বোচ্চ সিদ্ধি নয়, এমনকি পরমাত্মা উপলব্ধিও সর্বোচ্চ সিদ্ধি নয় । এখানে *মনীষিত* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ । সকলেই ভ্রান্তভাবে অথবা বাস্তবিকভাবে তাদের বিদ্যার গৌরবে গর্বান্বিত । কিন্তু ভগবান বলেছেন যে বিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ ফল হচ্ছে সর্বপ্রকার মোহমুক্ত হয়ে তাঁর ধাম সহ তাঁকে জানা ।

## শ্লোক ২৩

**প্রত্যাদিষ্টং ময়া তত্র ত্বয়ি কর্মবিমোহিতে ।**
**তপো মে হৃদয়ং সাক্ষাদাত্মাহং তপসোঽনঘ ॥ ২৩ ॥**

**প্রত্যাদিষ্টম্**—আদিষ্ট হয়ে ; **ময়া**—আমার দ্বারা ; **তত্র**—কারণে ; **ত্বয়ি**—তোমাকে ; **কর্ম**—কর্তব্য ; **বিমোহিতে**—মোহগ্রস্ত হয়ে ; **তপঃ**—তপস্যা ; **মে**—আমাকে ; **হৃদয়ম্**—হৃদয় ; **সাক্ষাৎ**—প্রত্যক্ষভাবে ; **আত্মা**—জীবন এবং আত্মা ; **অহম্**—আমি স্বয়ং ; **তপসঃ**—তপস্বী ; **অনঘ**—হে নিষ্পাপ ।

## অনুবাদ

**হে নিষ্পাপ ব্রহ্মা ! আমার কাছে অবগত হও যে, সৃষ্টির প্রারম্ভে তুমি যখন তোমার কর্তব্য সম্বন্ধে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিলে তখন আমিই তোমাকে তপস্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলাম। এই তপস্যা আমার হৃদয় এবং আমি তপস্যার আত্মা। তাই তপস্যা আমার থেকে অভিন্ন।**

## তাৎপর্য

যে তপস্যার প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সাক্ষাৎ দর্শন করা যায় সেই ভগবদ্ভক্তিই হচ্ছে প্রকৃত তপস্যা, তা ছাড়া অন্য কিছু নয়। কেননা অপ্রাকৃত প্রেম সহকারে ভগবানের সেবা করার মাধ্যমেই কেবল ভগবানের সান্নিধ্য লাভ করা যায়। এই প্রকার তপস্যা ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি এবং তা তাঁর থেকে অভিন্ন। এই অন্তরঙ্গা শক্তি জড় বিষয় ভোগের প্রতি অনাসক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পায়। আধিপত্য করার প্রবণতার ফলে জীব জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের ফলে এই উপভোগ করার প্রবণতা থেকে মুক্ত হওয়া যায়। ভগবদ্ভক্ত আপনা থেকেই জাগতিক সুখভোগের প্রতি অনাসক্ত হয়, এবং এই বৈরাগ্যই হচ্ছে প্রকৃত জ্ঞানের ফল। তাই ভগবদ্ভক্তির তপস্যায় জ্ঞান এবং বৈরাগ্য নিহিত রয়েছে, এবং সেটি হচ্ছে অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ।

কেউ যদি তার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে চায়, তাহলে জড় জগতের মায়িক সমৃদ্ধি সে উপভোগ করতে পারে না। যাদের ভগবানের সান্নিধ্যে অপ্রাকৃত আনন্দের কোন ধারণা নেই, তারা মূর্খতাবশত এই অনিত্য জড় জগতে সুখভোগের বাসনা করে। *শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে* বলা হয়েছে যে কেউ যদি ঐকান্তিকভাবে ভগবানকে দর্শন করতে চায় এবং সেই সঙ্গে জড় সুখ ভোগ করতে চায়, তা হলে বুঝতে হবে যে সে অতি মূর্খ। যারা জড় সুখভোগের জন্য এই জগতে থাকতে চায়, তাদের ভগবানের নিত্যধামে প্রবেশ করার কোন প্রয়োজন নেই। এইপ্রকার মূর্খ ভক্তকে কৃপা করে ভগবান তার সমস্ত জাগতিক সম্পদ হরণ করে নেন। এইপ্রকার মূর্খ

ভক্ত যদি তার সম্পত্তি ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করে, তখন ভগবান কৃপা করে পুনরায় তার সর্বকিছু হরণ করে নেন। এইভাবে জড় সমৃদ্ধি লাভে বার বার ব্যর্থ হয়ে সে তার পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে ওঠে। জড় জগতে পরিবার-পরিজন এবং বন্ধু-বান্ধবেরা তাদেরই প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে যারা যে কোনও প্রকারে ধনসম্পদ অর্জনে সফল হয়েছে। এইভাবে ভগবানের মূর্খ ভক্তরা ভগবানের কৃপায় তপস্যা করতে বাধ্য হয়, এবং অবশেষে পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় যুক্ত হয়ে সম্পূর্ণরূপে আনন্দ আস্বাদন করে। তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথবা ভগবান কর্তৃক বাধ্য হয়ে ভগবদ্ভক্তির যে তপস্যা, তা সিদ্ধি লাভের জন্য অত্যন্ত আবশ্যক, এবং এই প্রকার তপস্যা হচ্ছে ভগবানের অন্তরঙ্গা শক্তি।

সবরকম পাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হলে কিন্তু ভগবদ্ভক্তির তপস্যায় যুক্ত হওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বর্ণনা করা হয়েছে যে যারা সর্বতোভাবে পাপ-মুক্ত হয়েছে, তারাই কেবল ভগবানের আরাধনায় যুক্ত হতে পারে। ব্রহ্মাজী ছিলেন নিষ্পাপ এবং তাই তিনি সুদৃঢ় বিশ্বাস সহকারে ভগবান কর্তৃক "*তপ তপ*" শব্দে আদিষ্ট হয়ে তপস্যা করেছিলেন এবং ভগবান তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে তাঁর বাঞ্ছিত ফল প্রদান করেছিলেন। তাই প্রেম এবং তপস্যা এই দুইয়ের মিলনের প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায় এবং এইভাবে তাঁর পূর্ণ কৃপা লাভ করা যায়। তিনি নিষ্পাপীকে পরিচালিত করেন, নিষ্পাপ ভক্ত জীবনে পরম সিদ্ধি লাভ করেন।

## শ্লোক ২৪

**সৃজামি তপসৈবেদং গ্রসামি তপসা পুনঃ।**
**বিভর্মি তপসা বিশ্বং বীর্যং মে দুশ্চরং তপঃ ॥ ২৪ ॥**

**সৃজামি**—আমি সৃজন করি ; **তপসা**—সেই তপস্যা শক্তির দ্বারা ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **ইদম্**—এই ; **গ্রসামি তপসা**—সেই শক্তির দ্বারা আমি সংবরণ করি ; **পুনঃ**—পুনরায় ; **বিভর্মি**—পালন করি ; **তপসা**—তপস্যার দ্বারা ; **বিশ্বম্**—বিশ্ব ; **বীর্যম্**—শক্তি ; **মে**—আমার ; **দুশ্চরম্**—কঠোর ; **তপঃ**—তপস্যা।

## অনুবাদ

**এই প্রকার তপস্যার দ্বারা আমি এই বিশ্ব সৃষ্টি করি, পালন করি এবং সেই শক্তির দ্বারাই আমি তা সংবরণ করি। অতএব তপস্যাই হচ্ছে বাস্তবিক শক্তি।**

## তাৎপর্য

তপস্যা করার সময় আমাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার জন্য বদ্ধপরিকর হওয়া অবশ্য কর্তব্য এবং সেই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সবরকম দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। জড় জগতে সমৃদ্ধি, নাম এবং যশ অর্জনের জন্য কত কঠোর

তপস্যা করতে হয়, তা না হলে জড় জগতে প্রসিদ্ধ হওয়া যায় না। তা হলে ভগবদ্ভক্তিতে সিদ্ধি লাভের জন্য কঠোর তপস্যা কেন করতে হবে ? সুখের জীবন এবং পরমার্থ উপলব্ধির সিদ্ধি এক সঙ্গে সম্ভব নয়। ভগবান যে কোন জীবের থেকে অধিক চতুর ; তাই তিনি দেখতে চান ভক্তির জন্য ভক্ত কতটা কষ্ট স্বীকার করতে চায়। সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে অথবা তাঁর প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর কাছ থেকে আদেশ প্রাপ্ত হওয়ার পর, সমস্ত কঠোরতা সত্ত্বেও সেই নির্দেশ পালন করাই হচ্ছে কঠোর তপস্যা। যিনি দৃঢ়তা সহকারে এই নিয়ম পালন করেন, তিনি অবশ্যই ভগবানের কৃপা লাভে সফল হবেন।

## শ্লোক ২৫

**ব্রহ্মোবাচ**

**ভগবন্ সর্বভূতানামধ্যক্ষোঽবস্থিতো গুহাম্।**
**বেদ হ্যপ্রতিরুদ্ধেন প্রজ্ঞানেন চিকীর্ষিতম্ ॥ ২৫ ॥**

**ব্রহ্মা উবাচ**—শ্রীব্রহ্মা বললেন ; **ভগবন্**—হে প্রভু ; **সর্বভূতানাম্**—সমস্ত জীবের ; **অধ্যক্ষঃ**—পরিচালক ; **অবস্থিতঃ**—স্থিত ; **গুহাম্**—হৃদয় অভ্যন্তরে ; **বেদ**—জানা ; হি—নিশ্চিতভাবে ; **অপ্রতিরুদ্ধেন**—নির্বিঘ্নে ; **প্রজ্ঞানেন**—চরম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ; **চিকীর্ষিতম্**—প্রয়াস করে।

## অনুবাদ

**ব্রহ্মা বললেন, হে ভগবান ! পরম নিয়ন্তারূপে আপনি প্রতিটি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত এবং তাই আপনি আপনার অপ্রতিহত প্রজ্ঞার প্রভাবে সকলেরই প্রচেষ্টা সম্বন্ধে অবগত।**

## তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে যে ভগবান সকলেরই হৃদয়ে সাক্ষীরূপে বিরাজমান, এবং সেই সূত্রে তিনি পরম উপদেষ্টা এবং অনুমন্তা। উপদেষ্টা কর্মফলের ভোক্তা নন,কেননা ভগবানের অনুমোদন ব্যতীত কেউই উপভোগ করতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে, মাদকদ্রব্য নিষিদ্ধ অঞ্চলে পানাসক্ত ব্যক্তিকে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের পরিচালকের কাছে অনুমোদন-পত্র দিতে হয়, এবং পরিচালক তার অবস্থা বিবেচনা করে তাকে কেবল কিছু পরিমাণ সুরা অনুমোদন করেন। তেমনই, সমগ্র জড় জগৎ পানাসক্ত ব্যক্তিতে পরিপূর্ণ, অর্থাৎ এই জড় জগতে প্রতিটি জীবই বিষয় সুখ ভোগের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত এবং তাদের বাসনা চরিতার্থ করার প্রবণতা অত্যন্ত প্রবল। সর্বশক্তিমান ভগবান জীবের প্রতি পিতৃবৎ সদয় হয়ে তাদের শিশু সুলভ ভোগের বাসনা পূরণ করেন। এই প্রকার মনোবাসনা চরিতার্থ করার ফলে জীব কিন্তু

কখনো প্রকৃত আনন্দ উপভোগ করতে পারে না, সে কেবল তার অর্থহীন দেহের আবেদনগুলি চরিতার্থ করে ; কিন্তু তার ফলে তার কোন লাভ হয় না। পানাসক্ত ব্যক্তির যেমন সুরাপানের মাধ্যমে কোন লাভ হয় না, কিন্তু যেহেতু সে সুরাপানের বদ অভ্যাসের দাস হয়েছে, এবং যেহেতু সে তার সেই বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করার ইচ্ছা করে না, তাই কৃপাময় ভগবান তার সেই বাসনা চরিতার্থ করার সমস্ত সুযোগ দেন।

নির্বিশেষবাদীরা বাসনাশূন্য হওয়ার উপদেশ দেয় এবং অন্যেরা সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগ করার নির্দেশ দেয়। কিন্তু তা অসম্ভব ; কেউই সম্পূর্ণরূপে বাসনা পরিত্যাগ করতে পারে না, কেননা বাসনা হচ্ছে জীবনের লক্ষণ। বাসনাবিহীন জীব মৃত, যা প্রকৃতপক্ষে সে নয়। তাই জীবন এবং বাসনা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। বাসনার চরম চরিতার্থতা তখনই হয় যখন জীব ভগবানের সেবা করার বাসনা করে, এবং ভগবানও চান যে প্রতিটি জীব যেন তার সমস্ত ব্যক্তিগত বাসনা পরিত্যাগ করে তাঁর বাসনার অনুকূলে চলে। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শেষ উপদেশ। ব্রহ্মাজী ভগবানের সেই নির্দেশ স্বীকার করেছিলেন, এবং তাই শূন্য ব্রহ্মাণ্ডে জীব সৃষ্টি করার অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ পদ তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। ভগবানের সঙ্গে এক হওয়ার অর্থ হচ্ছে ভগবানের বাসনার সঙ্গে আমাদের বাসনা যুক্ত করা, তার ফলে সমস্ত বাসনা পূর্ণতা লাভ করে।

পরমাত্মারূপে পরমেশ্বর ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে কি রয়েছে তা জানেন, এবং অন্তঃস্থিত ভগবানের জ্ঞান ব্যতীত কেউই কোন কিছু করতে পারে না। তাঁর পরম বুদ্ধিমত্তার প্রভাবে, ভগবান সকলকে সম্পূর্ণরূপে তাদের বাসনা চরিতার্থ করার সুযোগ দেন এবং তার ফলও ভগবানই প্রদান করেন।

## শ্লোক ২৬

**তথাপি নাথমানস্য নাথ নাথয় নাথিতম্।**
**পরাবরে যথা রূপে জানীয়াং তে ত্বরূপিণঃ ॥ ২৬ ॥**

**তথা অপি**—তা সত্ত্বেও ; **নাথমানস্য**—আকাঙ্ক্ষাকারীর ; **নাথ**—হে ভগবান ; **নাথয়**—দয়া করে প্রদান করুন ; **নাথিতম্**—বাসনা অনুসারে ; **পর-অবরে**—জড় এবং চিন্ময় উভয় বিষয়ে ; **যথা**—যেমন ; **রূপে**—রূপে ; **জানীয়াম্**—জানা হোক ; **তে**—আপনার ; **তু**—কিন্তু ; **অরূপিণঃ**—রূপহীন।

### অনুবাদ

**হে প্রভু ! তা সত্ত্বেও আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করছি আপনি কৃপা করে আমার বাসনা চরিতার্থ করুন। দয়া করে আপনি আমাকে বলুন, আপনার চিন্ময় রূপ সত্ত্বেও আপনি কিভাবে জড় রূপ পরিগ্রহ করেছেন, যদিও আপনার সে রকম কোন রূপ নেই।**

### শ্লোক ২৭

**যথাত্মমায়াযোগেন নানাশক্ত্যুপবৃংহিতম্ ।**
**বিলুম্পন্ বিসৃজন্ গৃহ্নন্ বিভ্রদাত্মানমাত্মনা ॥ ২৭ ॥**

**যথা**—যতখানি ; **আত্ম**—স্বীয় ; **মায়া**—শক্তি ; **যোগেন**—যুক্ত করার দ্বারা ; **নানা**—বিবিধ ; **শক্তি**—শক্তি ; **উপবৃংহিতম্**—সমন্বয়ের মাধ্যমে ; **বিলুম্পন্**—বিনাশ করার ব্যাপারে ; **বিসৃজন্**—সৃষ্টি করার ব্যাপারে ; **গৃহ্নন্**—গ্রহণ করেন ; **বিভ্রৎ**—পালন করার ব্যাপারে ; **আত্মানম্**—নিজেকে ; **আত্মনা**—নিজের দ্বারা ।

### অনুবাদ

**(দয়া করে আপনি আমাকে বলুন) আপনি কিভাবে আপনার আপনার বিভিন্ন শক্তির সমন্বয়ের মাধ্যমে সংহার করেন, সৃষ্টি করেন এবং পালন করেন ।**

### তাৎপর্য

সমগ্র সৃষ্টি ভগবানের বিভিন্ন শক্তির, যথা অন্তরঙ্গা,বহিরঙ্গা এবং তটস্থা শক্তির মাধ্যমে ভগবানেরই প্রকাশ, ঠিক যেমন সূর্যকিরণ সূর্য মণ্ডলের শক্তির প্রকাশ । এইপ্রকার শক্তি যুগপৎ ভগবানের থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন, ঠিক যেমন সূর্যরশ্মি যুগপৎ সূর্য মণ্ডল থেকে ভিন্ন এবং অভিন্ন। ভগবানের বিভিন্ন শক্তি ভগবান এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব প্রমুখ প্রতিনিধির নির্দেশে সমন্বয়ের মাধ্যমে ক্রিয়া করে। ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব হচ্ছেন ভগবানের বিভিন্ন অবতার। পক্ষান্তরে বলা যায় যে ভগবান ব্যতীত আর কিছুই নেই, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভগবান এই সমস্ত প্রকাশিত কার্যকলাপ থেকে ভিন্ন। সেটি কিভাবে হয় সে কথা পরে বিশ্লেষণ করা হবে।

### শ্লোক ২৮

**ক্রীড়স্যমোঘসংকল্প ঊর্ণনাভির্যথোর্ণুতে ।**
**তথা তদ্বিষয়াং ধেহি মনীষাং ময়ি মাধব ॥ ২৮ ॥**

**ক্রীড়সি**—আপনি যেভাবে ক্রীড়া করেন ; **অমোঘ**—অচ্যুত ; **সংকল্প**—সংকল্প ; **ঊর্ণনাভিঃ**—মাকড়সা ; **যথা**—যেমন ; **ঊর্ণুতে**—আচ্ছাদিত করে ; **তথা**—তেমন ; **তৎ-বিষয়াম্**—এই সমস্ত বিষয়ে ; **ধেহি**—আমাকে জানতে দিন ; **মনীষাম্**—দর্শনের দ্বারা ; **ময়ি**—আমাকে ; **মাধব**—হে সমস্ত শক্তির ঈশ্বর ।

### অনুবাদ

**হে মাধব ! দয়া করে সে সমস্ত বিষয়ে আমাকে দর্শনের মাধ্যমে অবগত করুন। ঊর্ণনাভের মতো আপনি আপনার স্বীয় শক্তির দ্বারা নিজেকে আবৃত করেন, এবং আপনার সংকল্প অচ্যুত ।**

## তাৎপর্য

ভগবানের অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে সৃষ্টির প্রতিটি উপাদানের দ্রব্যশক্তি, জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তি নামক স্বীয় শক্তি রয়েছে। ভগবানের এই সমস্ত শক্তির সমন্বয়ের ফলে এবং কালের প্রভাবে তাঁর বিভিন্ন প্রতিনিধি ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয় কার্য সম্পাদিত হয়। ব্রহ্মা সৃষ্টি করেন, বিষ্ণু পালন করেন এবং শিব ধ্বংস করেন। কিন্তু ভগবানের এই সমস্ত প্রতিনিধি এবং সৃষ্টিশক্তি ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়, এবং সেই সূত্রে ভগবান ব্যতীত আর কিছু নেই, অথবা বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে পরম উৎস একটিই। তার আদর্শ দৃষ্টান্ত হচ্ছে মাকড়সা এবং তার জাল। মাকড়সা সেই জাল সৃষ্টি করে, তা পালন করে এবং তার ইচ্ছা অনুসারে সে তা গুটিয়ে নেয়। মাকড়সা তার জালের মধ্যে আচ্ছাদিত। একটি নগণ্য মাকড়সা যদি তার ইচ্ছানুসারে কার্য সাধনে এত শক্তিশালী হতে পারে, তা হলে পরমেশ্বর ভগবান কেন তাঁর ইচ্ছার দ্বারা জড়জগৎ সৃষ্টি, পালন এবং ধ্বংস করতে পারবেন না? ভগবানের কৃপায় ব্রহ্মার মতো ভক্ত অথবা পরম্পরা ধারায় কোন ভক্ত হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন যে, পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির মাধ্যমে নিরন্তর তাঁর অপ্রাকৃত লীলা বিলাসে যুক্ত।

## শ্লোক ২৯

**ভগবচ্ছিক্ষিতমহং করবাণি হ্যতন্দ্রিতঃ।**
**নেহমানঃ প্রজাসর্গং বধ্যেয়ং যদনুগ্রহাৎ॥ ২৯॥**

**ভগবৎ**—পরমেশ্বর ভগবানের দ্বারা; **শিক্ষিতম্**—শিক্ষিত; **অহম্**—আমি; **করবাণি**—আচরণের দ্বারা; **হি**—নিশ্চয়ই; **অতন্দ্রিতঃ**—সহায়ক; **ন**—কখনোই না; **ইহমানঃ**—কার্য করা সত্ত্বেও; **প্রজাসর্গম্**—প্রজা সৃষ্টির ব্যাপারে; **বধ্যেয়ম্**—বদ্ধ হওয়া; **যৎ**—প্রকৃতপক্ষে; **অনুগ্রহাৎ**—কৃপার দ্বারা।

## অনুবাদ

**দয়া করে আপনি আমাকে বলুন যাতে আমি আপনার দ্বারা শিক্ষিত হয়ে আপনার প্রতিনিধিরূপে জীব সৃষ্টির কার্য করতে পারি এবং সেই প্রকার কার্যে যুক্ত হওয়া সত্ত্বেও বদ্ধ হয়ে না পড়ি।**

## তাৎপর্য

ব্রহ্মাজী তাঁর নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে অনুমান করতে চাননি এবং জড় জগতের বন্ধনে আবদ্ধ হতে চাননি। সকলেরই বিশুদ্ধ চেতনায় জানা উচিত যে, সমস্ত কার্য সম্পাদনে সে হচ্ছে একটি যন্ত্র মাত্র। জীব বদ্ধ অবস্থায় ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতি, গুণময়ী মায়া কর্তৃক যন্ত্রের মতো পরিচালিত হয় এবং মুক্ত অবস্থায় সরাসরিভাবে পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হয়। সরাসরিভাবে ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা

পরিচালিত হওয়াই জীবের স্বরূপগত অবস্থা, কিন্তু ভগবানের মায়া-শক্তি কর্তৃক পরিচালিত হওয়া জীবের বদ্ধ অবস্থা। বদ্ধ অবস্থায় জীব পরম সত্য এবং তার কার্যকলাপ সম্বন্ধে জল্পনা-কল্পনা করে। কিন্তু মুক্ত অবস্থায় সে সরাসরিভাবে ভগবানের কাছ থেকে জ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং এই প্রকার মুক্ত আত্মার সমস্ত কার্যকলাপ সর্বতোভাবে ক্রটিহীন এবং জল্পনা-কল্পনা করার অভ্যাস থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০-১১) বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে যে নিরন্তর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত শুদ্ধ ভক্তেরা প্রত্যক্ষভাবে ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হন এবং তার ফলে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার পথে অবিচলিতভাবে অগ্রসর হন। তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তরা কখনো তাঁদের প্রগতির গর্বে গর্বিত হন না, কিন্তু মনোধর্মী অভক্তেরা মায়ার গভীরতম অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং সেই সমস্ত লক্ষ্যভ্রষ্ট জীবেরা তাদের জল্পনা-কল্পনাভিত্তিক ভ্রান্ত জ্ঞানের গর্বে অত্যন্ত গর্বিত। ব্রহ্মা যদিও এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তথাপি তিনি সেই গর্বের প্রভাবে অধঃপতনের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেতে চেয়েছিলেন।

## শ্লোক ৩০

**যাবৎ সখা সখ্যুরিবেশ তে কৃতঃ**
**প্রজাবিসর্গে বিভজামি ভো জনম্।**
**অবিক্লবস্তে পরিকর্মণি স্থিতো**
**মা মে সমুন্নদ্ধমদোঽজমানিনঃ ॥ ৩০ ॥**

**যাবৎ**—যেমন; **সখা**—বন্ধু; **সখ্যুঃ**—বন্ধুকে; **ইব**—তেমন; **ঈশ**—হে ভগবান; **তে**—আপনি; **কৃতঃ**—স্বীকার করেছেন; **প্রজা**—জীব; **বিসর্গে**—সৃষ্টির বিষয়ে; **বিভজামি**—আমি যা ভিন্নভাবে করব; **ভোঃ**—হে প্রভু; **জনম্**—যাদের জন্ম হয়েছে; **অবিক্লবঃ**—অবিচলিতভাবে; **তে**—আপনার; **পরিকর্মণি**—সেবার ব্যাপারে; **স্থিতঃ**—এইভাবে অবস্থিত; **মা**—তা যেন কখনো না হয়; **মে**—আমাকে; **সমুন্নদ্ধ**—ফলস্বরূপ; **মদঃ**—মত্ততা; **অজ**—হে জন্মহীন; **মানিনঃ**—এইভাবে যাঁকে মনে করা হয়।

## অনুবাদ

**হে প্রভু, হে অজ! বন্ধু যেমন বন্ধুর সঙ্গে করমর্দন করে, আপনিও সেভাবে আমার সঙ্গে করেছেন (যেন আমি আপনার সমকক্ষ)। বিভিন্ন প্রকার জীবের সৃষ্টির ব্যাপারে আমি যুক্ত হব এবং এইভাবে আমি আপনার সেবায় নিযুক্ত হব। আমি বিচলিত হব না, কিন্তু আমি আপনার কাছে প্রার্থনা করি যেন তার ফলে আমি নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করে গর্বান্বিত না হই।**

## তাৎপর্য

ব্রহ্মা নিশ্চিতভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সখ্য রসে সম্পর্কিত। প্রতিটি জীব পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর, এই পাঁচটি অপ্রাকৃত রসের যে কোন একটির দ্বারা সম্পর্কিত। পরমেশ্বর ভগবানের সম্পর্কে এই পাঁচটি রসের কথা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি। এখানে স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করা হয়েছে যে ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সখ্য রসে সম্পর্কিত।

শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সঙ্গে যে কোন একটি অপ্রাকৃত রসে সম্পর্কিত হতে পারেন, এমনকি বাৎসল্য রসেও সম্পর্কিত হতে পারেন ; কিন্তু সর্ব অবস্থাতেই ভক্ত ভগবানের অপ্রাকৃত সেবক। কেউই ভগবানের সমকক্ষ নন অথবা ভগবান থেকে শ্রেষ্ঠ নন। সেটিই হচ্ছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বাণী।

ব্রহ্মাজী যদিও ভগবানের সঙ্গে সখ্য রসে সম্পর্কিত এবং যদিও তিনি বিভিন্ন প্রকার জীব সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ দায়িত্বপূর্ণ পদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, তথাপি তিনি সচেতন ছিলেন যে তিনি পরমেশ্বর ভগবান নন অথবা পরম শক্তিমান নন।

কখনো কখনো এই ব্রহ্মাণ্ডে অথবা ব্রহ্মাণ্ডের বাইরে কোন অত্যন্ত শক্তিশালী ব্যক্তি ভগবানের থেকেও অধিক শক্তি প্রদর্শন করতে পারেন, কিন্তু তা হলেও ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত জানেন যে সেই শক্তি ভগবানেরই বিভূতি, এবং এই প্রকাব শক্ত্যাবিষ্ট জীব কখনোই স্বতন্ত্র নন।

শ্রীহনুমানজী লাফ দিয়ে ভারত মহাসাগর পার হয়েছিলেন, অথচ শ্রীরামচন্দ্র সেতু বন্ধন করে পায়ে হেঁটে সমুদ্র পার হয়েছিলেন। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে হনুমান ভগবান রামচন্দ্রের থেকে অধিক শক্তিশালী ছিলেন। ভগবান কখনো কখনো তাঁর ভক্তকে অলৌকিক শক্তি প্রদান করেন, কিন্তু ভক্ত সর্বদাই জানেন যে সেই শক্তি ভগবানের এবং তিনি স্বয়ং ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র।

অভক্তরা নিজেকে ভগবান বলে মনে করে গর্বোদ্ধত হয়, শুদ্ধ ভক্তরা কিন্তু কখনোই সেরকম নয়। এটি অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে প্রতি পদক্ষেপে ভগবানের মায়াশক্তি কর্তৃক পদাহত হচ্ছে যে ব্যক্তি, সে ভ্রান্তভাবে মনে করে যে সে ভগবান হবে। এইপ্রকার মনোভাব মায়ার চরম বন্ধন।

জীবের প্রথম মোহ হচ্ছে যে সে ধনসম্পদ এবং শক্তি সঞ্চার করে জড় জগতের উপর প্রভুত্ব করবে, কিন্তু তার সেই প্রচেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে চরমে সে ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। অতএব এই জড় জগতে সবচাইতে শক্তিশালী ব্যক্তি হওয়া এবং ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার বাসনা দুটিই মায়ার দুটি বন্ধন।

কিন্তু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত যেহেতু ভগবানের শরণাগত, তাই তাঁরা মায়ার এই মোহময়ী বন্ধনের অতীত। ব্রহ্মা যেহেতু ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত, তাই এই জড় জগতে সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রণকারী দেবতা হওয়া সত্ত্বেও এবং নানাপ্রকার অতি অদ্ভুত কার্যকলাপ সম্পাদনে সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও তিনি মূর্খ অভক্তদের মতো ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে

যাওয়ার ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেননি। যে সমস্ত মূর্খ মানুষেরা ভগবানের সঙ্গে এক হয়ে যাওয়ার অসৎ বাসনা পোষণ করে, তাদের ব্রহ্মাজীর আদর্শ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করেন না। সৃষ্টির প্রারম্ভে বিভিন্ন জীবদের পূর্বকল্পে তাদের কর্ম অনুসারে দেহ প্রদান করার ক্ষমতা কেবল তাঁর উপর ন্যস্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মাজীর কর্তব্য হচ্ছে জীবদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তাদের উপযুক্ত কর্তব্য কর্মে নিযুক্ত করা। ব্রহ্মাজী তাঁর খেয়াল-খুশিমতো বিভিন্ন স্তরের জীব সৃষ্টি করেন না, পক্ষান্তরে তিনি জীবদের উপযুক্ত কর্তব্য সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন প্রকার শরীর দান করার কার্যে নিযুক্ত। এমন মহান দায়িত্ব পালন করা সত্ত্বেও তিনি সর্বদাই সচেতন যে তিনি কেবল ভগবানের হাতের ক্রীড়নক মাত্র, এবং তিনি সর্বদাই সর্তক থাকেন যেন কখনো তিনি নিজেকে পরমেশ্বর ভগবান বলে মনে না করেন।

ভগবানের ভক্তরা ভগবান প্রদত্ত বিশেষ বিশেষ কর্তব্য সম্পাদনে যুক্ত থাকেন, এবং এই প্রকার কর্তব্য নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে তাঁরা সক্ষম হন, কেননা তাঁরা ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত হয়েছেন। এই সাফল্যের গৌরব ভক্তেরা গ্রহণ করেন না, তা তাঁরা সর্বদাই ভগবানকে প্রদান করেন। কিন্তু মূর্খ ব্যক্তিরা ভগবানকে কোনরকম স্বীকৃতি না দিয়ে নিজেরাই তাদের সাফল্যের সমস্ত গৌরব গ্রহণ করতে চায়। এটিই হচ্ছে অভক্তদের লক্ষণ।

## শ্লোক ৩১

### শ্রীভগবানুবাচ

**জ্ঞানং পরমগুহ্যং মে যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতম্।**
**সরহস্যং তদঙ্গং চ গৃহাণ গদিতং ময়া ॥ ৩১ ॥**

**শ্রীভগবান উবাচ**—পরমেশ্বর ভগবান বললেন ; **জ্ঞানম্**—লব্ধ জ্ঞান ; **পরম**— অত্যন্ত ; **গুহ্যম্**—গোপনীয় ; **মে**—আমার ; **যৎ**—যা ; **বিজ্ঞান**—উপলব্ধি ; **সমন্বিতম্**—সমন্বিত ; **সরহস্যম্**—ভক্তিসহকারে ; **তৎ**—তার ; **অঙ্গম্ চ**—আনুষঙ্গিক সামগ্রী ; **গৃহাণ**—গ্রহণ করার চেষ্টা কর ; **গদিতম্**—বিশ্লেষিত ; **ময়া**—আমার দ্বারা।

### অনুবাদ

**পরমেশ্বর ভগবান বললেন—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে যে জ্ঞান বর্ণিত হয়েছে তা অত্যন্ত গোপনীয়, এবং তা ভক্তি সহকারে উপলব্ধি করতে হয়। সেই পন্থার আনুষঙ্গিক অঙ্গসমূহ আমি বিশ্লেষণ করছি তুমি তা যত্ন সহকারে গ্রহণ কর।**

### তাৎপর্য

এই ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মা হচ্ছেন ভগবানের শ্রেষ্ঠ ভক্ত এবং তাই তিনি তাঁর চারটি মুখ্য প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন চারটি গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতির মাধ্যমে, যা *চতুঃশ্লোকী ভাগবত* নামে

পরিচিত। ব্রহ্মার প্রশ্নগুলি ছিল—(১) জড় এবং চিন্ময় উভয় স্তরে ভগবানের রূপ কি রকম ? (২) ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কিভাবে ক্রিয়া করে ? (৩) ভগবান কিভাবে তাঁর বিভিন্ন শক্তিতে লীলা বিলাস করেন ? (৪) ব্রহ্মা কিভাবে তাঁর কর্তব্য সম্পাদন করবেন ? সেই প্রশ্নগুলির উত্তরের ভূমিকাস্বরূপ এই শ্লোকটির মাধ্যমে ভগবান ব্রহ্মাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁর সম্বন্ধীয় পরম তত্ত্বজ্ঞান যা শাস্ত্রে বর্ণিত হয়েছে, তা অত্যন্ত সূক্ষ্ম এবং ভগবানের কৃপায় আত্ম-উপলব্ধি না হওয়া পর্যন্ত সেই জ্ঞান হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। ভগবান ব্রহ্মাকে বলেছেন যে তিনি যেভাবে সেগুলি বিশ্লেষণ করছেন তা যেন তিনি যত্নসহকারে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞান তখনই হৃদয়ঙ্গম করা যায় যখন ভগবান স্বয়ং তা কাউকে জানান। সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানীরাও তাঁদের মনীষার দ্বারা পরম তত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন না। মনোধর্মীজ্ঞানীরা বড় জোর নির্বিশেষ ব্রহ্ম-উপলব্ধি করতে পারেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরম তত্ত্ব সম্বন্ধীয় পূর্ণজ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অতীত। তাই তাকে বলা হয় গুহ্যতম জ্ঞান।

বহু মুক্ত আত্মাদের মধ্যে কদাচিৎ দু-একজন পরমেশ্বর ভগবানকে জানার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজেও বলেছেন যে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কদাচিৎ একজন সিদ্ধি লাভের প্রচেষ্টা করে, এবং বহু সিদ্ধ জীবের মধ্যে কদাচিৎ একজন তাঁকে যথাযথভাবে জানতে পারে। তাই পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞান ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই কেবল লাভ করা সম্ভব। *রহস্যম্* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপদেশ দিয়েছিলেন কেননা অর্জুন ছিলেন তাঁর ভক্ত এবং সখা। এই যোগ্যতা ব্যতীত কেউই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার রহস্য উন্মোচন করতে পারে না। তাই ভগবানের ভক্ত হয়ে ভগবানের প্রতি প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন না করলে কেউই পরমেশ্বর ভগবানকে জানতে পারে না। এই রহস্য হচ্ছে *ভগবৎ-প্রেম*। পরমেশ্বর ভগবানের রহস্য জানার এটিই হচ্ছে প্রধান যোগ্যতা; আর ভগবৎ-প্রেমের অপ্রাকৃত স্তর লাভ করতে হলে অবশ্যই ভগবদ্ভক্তির বিধি অনুসরণ করতে হবে। এই বিধিকে বলা হয় বিধি-ভক্তি, এবং নবীন ভক্ত তার বর্তমান ইন্দ্রিয়সমূহের দ্বারা এই বিধিভক্তির অনুশীলন করতে পারেন। এই বিধি প্রধানত ভগবানের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। ভগবদ্ভক্তের সঙ্গেই কেবল এই প্রকার শ্রবণ এবং কীর্তন সম্ভব।

ভগবদ্ভক্তিতে সিদ্ধিলাভের জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাই পাঁচটি প্রধান বিধির নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তার প্রথমটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তের সঙ্গ; দ্বিতীয়টি হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন; তৃতীয়, শুদ্ধ ভক্তের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ; চতুর্থ, ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত পবিত্র স্থানে বাস; এবং পঞ্চমটি হচ্ছে ভক্তি সহকারে ভগবানের শ্রীবিগ্রহের আরাধনা করা। এই প্রকার বিধিবিধানগুলি ভগবদ্ভক্তির অঙ্গ। সুতরাং ব্রহ্মার অনুরোধ অনুসারে পরমেশ্বর ভগবান তাঁর চারটি প্রশ্নের উত্তর পূর্ণরূপে বিশ্লেষণ করবেন এবং সেই প্রশ্নগুলির আনুষঙ্গিক প্রশ্নগুলিরও উত্তর দেবেন।

## শ্লোক ৩২

**যাবানহং যথাভাবো যদ্রূপগুণকর্মকঃ ।
তথৈব তত্ত্ববিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ ॥ ৩২ ॥**

**যাবান্**—আমার নিত্যরূপে ; **অহম্**—আমি ; **যথা**—যেমন ; **ভাবঃ**—চিন্ময় অস্তিত্ব ; **যৎ**—যারা ; **রূপ**—বিভিন্ন রূপ এবং বর্ণ ; **গুণ**—গুণাবলী ; **কর্মকঃ**— কার্যকলাপ ; **তথা**—তেমন ; **এব**—নিশ্চিতভাবে ; **তত্ত্ববিজ্ঞানম্**—বাস্তব উপলব্ধি ; **অস্তু**—হোক ; **তে**—তোমার ; **মৎ**—আমার ; **অনুগ্রহাৎ**—অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে।

## অনুবাদ

**আমার সবকিছু, যথা আমার নিত্যরূপ এবং আমার চিন্ময় অস্তিত্ব, বর্ণ, গুণাবলী এবং কার্যকলাপ, আমার অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে বাস্তব উপলব্ধির মাধ্যমে তোমার অন্তরে প্রকাশিত হোক।**

## তাৎপর্য

পরম তত্ত্ব, পরমেশ্বর ভগবানের দুর্জ্ঞেয় জ্ঞান হৃদয়ঙ্গমকরার রহস্য হচ্ছে ভগবানের অহৈতুকী কৃপা। জড় জগতেও বহু পুত্রের পিতা তার নিজের রহস্য তার প্রিয় পুত্রের কাছে কেবল উদ্ঘাটন করে থাকে। যাকে সে যোগ্য পুত্র বলে মনে করে তার কাছেই সে তার গোপন তত্ত্ব প্রকাশ করে। সমাজে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিকে জানা যায় কেবল তার কৃপার মাধ্যমেই। তেমনই ভগবানকে জানার ব্যাপারেও অবশ্যই ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হতে হয়। ভগবান অসীম ; কেউই তাঁকে পূর্ণরূপে জানতে পারে না, কিন্তু ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় উন্নতি সাধন করার মাধ্যমে ভগবানকে জানার যোগ্যতা অর্জন করা যায়। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ভগবান ব্রহ্মাজীর প্রতি যথেষ্ট পরিমাণে প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাই তিনি তাঁর প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপা বর্ষণ করেছিলেন যাতে তিনি তাঁকে যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পারেন।

বেদেও বলা হয়েছে যে কেউই পরম তত্ত্ব পরমেশ্বর ভগবানকে জড় বিদ্যা অথবা বুদ্ধিমত্তার দ্বারা জানতে পারে না। সদ্গুরু এবং ভগবানের প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধার মাধ্যমেই কেবল ভগবানকে জানা যায়। এই প্রকার শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি যদি জড়জাগতিক বিচারে অশিক্ষিতও হন, তথাপি ভগবানের কৃপায় আপনা থেকেই তিনি ভগবানকে জানতে পারেন। ভগবদ্গীতাতেও বলা হয়েছে যে ভগবান সকলের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন না, এবং যারা অবিশ্বাসী তাদের কাছে তিনি তাঁর যোগমায়ার দ্বারা নিজেকে আবৃত করে রাখেন।

যারা শ্রদ্ধাশীল তাদের কাছে ভগবান তাঁর রূপ, গুণ এবং লীলা প্রকাশ করেন। নির্বিশেষবাদীরা যে ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করে তা সত্য নয়, তবে রূপ সম্বন্ধে

আমাদের যে অভিজ্ঞতা রয়েছে তা থেকে তাঁর রূপ ভিন্ন। ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তের কাছে তাঁর রূপ প্রকাশ করেন, এমনকি তাঁর মাপ পর্যন্ত, এবং এটিই হচ্ছে *যাবান্* শব্দের অর্থ, যা শ্রীমদ্ভাগবতের মহান তত্ত্ববিদ্ শ্রীল জীব গোস্বামী বিশ্লেষণ করে গেছেন।

ভগবান তাঁর অস্তিত্বের অপ্রাকৃত তত্ত্ব প্রকট করেন। জড় জল্পনা-কল্পনাকারীরা ভগবানের রূপ সম্বন্ধে নানারকম জড় ধারণা পোষণ করে। শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে ভগবানের কোন জড় রূপ নেই; তাই যারা অজ্ঞ তারা স্থির করে ভগবান নিশ্চয়ই নিরাকার। তারা জড় রূপ এবং চিন্ময় রূপের পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে না। তাদের মতে, জড় রূপ না থাকার অর্থ হল, নিরাকার। এই ধারণাটিও জড়, কেননা নিরাকারের ধারণা আকারের ধারণারই বিপরীত। জড় ধারণার নিবৃত্তি কখনো চিন্ময় তত্ত্বকে প্রকাশ করতে পারে না।

ব্রহ্ম-সংহিতায় বলা হয়েছে যে ভগবানের চিন্ময় রূপ রয়েছে এবং তিনি তাঁর যে কোন ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অন্য ইন্দ্রিয়ের কার্য সম্পাদন করতে পারেন। যেমন, তিনি তাঁর চক্ষুর দ্বারা আহার করতে পারেন এবং তাঁর পায়ের দ্বারা দর্শন করতে পারেন। জড় রূপে কেউ চক্ষুর দ্বারা আহার করতে পারে না অথবা পায়ের দ্বারা দর্শন করতে পারে না : সেটিই জড় দেহ এবং সচ্চিদানন্দময় চিন্ময় দেহের পার্থক্য।

চিন্ময় দেহ নিরাকার নয় ; এটি একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের দেহ যে সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে আমরা কোনরকম ধারণাই করতে পারি না। তাই নিরাকারের অর্থ হচ্ছে জড় আকারবিহীন অথবা চিন্ময় দেহ সমন্বিত, যে সম্বন্ধে অভক্তরা তাদের অনুমানের মাধ্যমে কোন ধারণাই করতে পারে না।

ভগবান তাঁর ভক্তের কাছে তাঁর অন্তহীন বৈচিত্র্যপূর্ণ চিন্ময় দেহ, যা বিভিন্ন রূপ সত্ত্বেও পরস্পর থেকে অভিন্ন. তা প্রকাশ করেন। ভগবানের কোন কোন চিন্ময় রূপ শ্যামবর্ণ এবং অন্য কোন রূপ শ্বেতবর্ণ। কোন রূপ রক্তবর্ণ এবং কোন রূপ পীত বর্ণ। তাঁর কোন রূপ চতুর্ভুজ এবং কোন রূপ দ্বিভুজ। কোন রূপ মৎস্যের মতো এবং কোন রূপ সিংহের মতো। ভগবানের এই সমস্ত চিন্ময় দেহ ভগবান তাঁর অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে তাঁর ভক্তের কাছে প্রকাশ করেন, এবং তাই নির্বিশেষবাদীদের ভগবানের নিরাকার হওয়ার অসৎ বিচার, ভক্তিমার্গে অনুন্নত ভক্তের কাছেও কোনরকম আবেদন সৃষ্টি করে না।

ভগবানের অন্তহীন চিন্ময় গুণাবলী রয়েছে, এবং তাদের একটি হচ্ছে তাঁর ঐকান্তিক ভক্তের প্রতি তাঁর বাৎসল্য। জড় জগতের ইতিহাসেও আমরা তাঁর চিন্ময় গুণাবলীর উপলব্ধি করতে পারি। ভগবান তাঁর ভক্তদের পরিত্রাণ করার জন্য এবং দুষ্কৃতকারীদের বিনাশের জন্য জগতে অবতরণ করেন। তাঁর সমস্ত কার্যকলাপ তাঁর ভক্তদের নিয়ে। শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তের সঙ্গে ভগবানের এই প্রকার লীলা-বিলাসের বর্ণনায় পূর্ণ, এবং অভক্তদের সেই সমস্ত লীলা-বিলাসের কোন ধারণাই নেই।

সাত বছর বয়সের বালকরূপে ভগবান গোবর্ধন পর্বত ধারণ করেছিলেন, এবং ইন্দ্র যখন ক্রুদ্ধ হয়ে বারি বর্ষণের দ্বারা বৃন্দাবনকে প্লাবিত করছিল, তখন তিনি তাঁর শুদ্ধ ভক্তদের ইন্দ্রের ক্রোধ থেকে রক্ষা করেছিলেন। যারা অবিশ্বাসী তাদের কাছে সাত বছরের বালকের গোবর্ধন পর্বত ধারণ করা অবিশ্বাস্য হতে পারে, কিন্তু ভক্তদের কাছে তা সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাসযোগ্য।

ভক্তেরা ভগবানের সর্বশক্তিমত্তায় বিশ্বাস করেন। কিন্তু যারা অবিশ্বাসী তারা মুখে ভগবানকে সর্বশক্তিমান বললেও প্রকৃতপক্ষে তা বিশ্বাস করে না। এইপ্রকার মূর্খেরা জানে না যে ভগবান চিরকালই ভগবান এবং লক্ষকোটি বছর ধরে ধ্যান করলেও অথবা কোটি কোটি বছর ধরে মনোধর্মপ্রসূত জ্ঞানের অনুশীলন করলেও কখনো ভগবান হওয়া যায় না।

জড় জল্পনা-কল্পনাপ্রবণ জ্ঞানীদের নির্বিশেষ ধারণা এই শ্লোকটিতে সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত হয়েছে। কেননা এখানে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবানের গুণ আছে, রূপ আছে, লীলা আছে এবং কোন মানুষের যা রয়েছে তা সবই ভগবানের মধ্যে আছে। ভগবানের চিন্ময় প্রকৃতি সম্বন্ধে এই সমস্ত বর্ণনা ভগবদ্ভক্তদের উপলব্ধ জ্ঞান। ভগবানের অহৈতুকী কৃপার প্রভাবে সেই জ্ঞান ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের কাছে প্রকাশিত হয়, এবং অন্য আর কারো কাছে হয় না।

## শ্লোক ৩৩

**অহমেবাসমেবাগ্রে নান্যদ্ যৎ সদসৎ পরম্।**
**পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্ ॥ ৩৩ ॥**

**অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **এব**—নিশ্চিতভাবে; **আসম্**—ছিলাম; **এব**—কেবল; **অগ্রে**—সৃষ্টির পূর্বে; **ন**—কখনোই না; **অন্যৎ**—অন্য কিছু; **যৎ**—সেই সমস্ত; **সৎ**—কার্য; **অসৎ**—কারণ; **পরম**—পরম; **পশ্চাৎ**—অন্তে; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান; **যৎ**—এই সমস্ত; **এতৎ**—সৃষ্টি; **চ**—ও; **যঃ**—সবকিছু; **অবশিষ্যেত**—অবশিষ্ট থাকে; **সঃ**—তা; **অস্মি**—হই; **অহম্**—আমি, পরমেশ্বর ভগবান।

## অনুবাদ

**হে ব্রহ্মা! সৃষ্টির পূর্বে পরমেশ্বর ভগবান আমিই একমাত্র বর্তমান ছিলাম, এবং তখন আমি ছাড়া অন্য কিছু ছিল না। এমনকি এই সৃষ্টির কারণীভূত প্রকৃতি পর্যন্ত ছিল না। সৃষ্টির পরেও একমাত্র আমিই আছি এবং প্রলয়ের পরেও পরমেশ্বর ভগবান একমাত্র আমি অবশিষ্ট থাকব।**

## তাৎপর্য

এখানে আমাদের অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে লক্ষ্য করতে হবে যে পরমেশ্বর ভগবান অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে বলছেন যে তিনিই কেবল পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন,

তিনিই কেবল সমগ্র সৃষ্টিকে পালন করেন এবং প্রলয়ের পর একমাত্র তিনিই অবশিষ্ট থাকেন। ব্রহ্মাও পরমেশ্বর ভগবানের সৃষ্টি। নির্বিশেষবাদীরা অদ্বৈতবাদ সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করে বলে যে, "*অহম্*" পরম সত্য থেকে উদ্ভূত হওয়ার ফলে ব্রহ্মাও সেই একই "*অহম্*" তত্ত্ব এবং সেই সূত্রে পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে ব্রহ্মার কোন পার্থক্য নেই, এবং এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে "*অহম্*" তত্ত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। নির্বিশেষবাদীদের এই যুক্তি মেনে নিলেও স্বীকার করতে হবে যে ভগবান হচ্ছেন স্রষ্টা "*অহম্*" এবং ব্রহ্মা হচ্ছেন সৃষ্ট "*অহম্*"। অতএব এই দুই "*অহম্*" এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, যেমন মুখ্য "*অহম্*" এবং গৌণ "*অহম্*"। অতএব নির্বিশেষবাদীদের যুক্তি মানলেও দুটি *অহম্* স্বীকার করতেই হয়। কিন্তু এখানে আমাদের সাবধানতা সহকারে লক্ষ্য করতে হবে যে বৈদিক শাস্ত্রে (*কঠোপনিষদে*) গুণ অনুসারে এই দুটি *অহম্* স্বীকার করা হয়েছে। *কঠোপনিষদে* বলা হয়েছে—

*নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*
*একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥*

স্রষ্টা "আমি" এবং সৃষ্ট "আমি"— এই দুটি আমিকেই বেদে গুণগতভাবে এক বলে স্বীকার করা হয়েছে, কেননা উভয়ই নিত্য এবং চেতন। কিন্তু তার একটি "আমি" হচ্ছে স্রষ্টা "আমি" এবং তা এক বচন, এবং সৃষ্ট "আমি" বহু বচন, কেননা ব্রহ্মার মতো এবং ব্রহ্মার সৃষ্ট বহু "আমি" রয়েছে। এটি একটি সরল সত্য।

পিতা পুত্র উৎপাদন করেন এবং পুত্রও অন্য বহু পুত্র উৎপাদন করে, এবং তারা সকলেই মানুষরূপে এক হলেও পুত্র এবং পৌত্ররা পিতা থেকে ভিন্ন। পুত্র এবং পৌত্ররা কখনো পিতার স্থান অধিকার করতে পারে না ; পিতা, পুত্র এবং পৌত্র যুগপৎ ভিন্ন এবং অভিন্ন মানুষরূপে তারা সকলেই এক, কিন্তু ব্যক্তিগত সম্পর্কের ভিত্তিতে তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন।

তাই বৈদিক শাস্ত্রে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট বা আশ্রয় "আমি" এবং আশ্রিত "আমি"—এই দুটির মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করে বর্ণনা করা হয়েছে আশ্রয় "আমি" আশ্রিত "আমি"কে পোষণ করে, এবং তার ফলে এই দুই "আমি" সত্তার মধ্যে বিরাট পার্থক্য রয়েছে।

এই শ্লোকের আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ভগবান এবং ব্রহ্মা উভয়েরই ব্যক্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। অতএব চরমে আশ্রয় তত্ত্ব এবং আশ্রিত তত্ত্ব উভয়েই ব্যক্তি। এই সিদ্ধান্ত নির্বিশেষবাদীদের সিদ্ধান্ত—"চরমে সবকিছুই নিরাকার" এই মতবাদকে খণ্ডন করে। অল্পজ্ঞ নির্বিশেষবাদীদের সিদ্ধান্ত এইভাবে খণ্ডিত হয়েছে যে আশ্রয় তত্ত্ব "আমি" হচ্ছে পরম সত্য এবং তিনি একজন সবিশেষ ব্যক্তি। আশ্রিত তত্ত্ব "আমি" ব্রহ্মাও একজন ব্যক্তি, কিন্তু তিনি পরম পুরুষ নন। নিজেকে চিন্ময় সত্তারূপে উপলব্ধি করার জন্য "আমি চিন্ময় তত্ত্ব" বা "আমি ব্রহ্ম" উপযোগী হতে পারে, কিন্তু আশ্রয় তত্ত্ব এবং আশ্রিত তত্ত্বের মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য রয়েছে, যা নির্বিশেষবাদীরা না বুঝতে পারলেও এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ব্রহ্মা এখানে মুখোমুখি তাঁর পরম

আশ্রয় ভগবানকে দর্শন করছেন, যিনি জড় সৃষ্টির বিনাশের পরেও তাঁর নিত্য চিন্ময়রূপে বিরাজ করেন। ব্রহ্মা ভগবানের যে রূপ দর্শন করেছেন তা ব্রহ্মার সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজমান ছিলেন এবং সমস্ত উপাদান এবং প্রকাশ সেই ভগবানেরই শক্তির বিস্তার। ভগবানের সেই শক্তির প্রদর্শন যখন শেষ হয়ে যায়, তখন যে অবশিষ্ট থাকে তাও সেই পরমেশ্বর ভগবান। অতএব সৃষ্টি, পালন এবং প্রলয়ের সর্ব অবস্থাতেই ভগবানের রূপ বর্তমান থাকে। *বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ একো নারায়ণ আসীন্ন ব্রহ্মা নেশান* ইত্যাদি বৈদিক মন্ত্রে এই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে। সৃষ্টির পূর্বে বাসুদেব ব্যতীত কেউ ছিলেন না। ব্রহ্মা ছিলেন না, শঙ্কর ছিলেন না। কেবল নারায়ণ ছিলেন এবং অন্য কেউ ছিলেন না, এমনকি ব্রহ্মা এবং ঈশানও নন। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্যও তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার টীকায় প্রতিপন্ন করেছেন যে নারায়ণ বা পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত জড় সৃষ্টির অতীত, কিন্তু সমগ্র সৃষ্টি অব্যক্ত থেকে উদ্ভূত। অতএব সৃষ্ট এবং স্রষ্টার মধ্যে সর্বদাই পার্থক্য রয়েছে, যদিও গুণগতভাবে স্রষ্টা এবং সৃষ্ট এক।

এই বর্ণনার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে পরম সত্য হচ্ছেন ভগবান বা পরম ঈশ্বর। পরমেশ্বর ভগবান এবং তাঁর ধাম পূর্বেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভগবানের ধাম শূন্য নয় বা রিক্ত নয়, যা নির্বিশেষবাদীরা মনে করে থাকে। বৈকুণ্ঠলোকসমূহ চিন্ময় বৈচিত্র্যে পূর্ণ। সেই ধামের চতুর্ভুজ অধিবাসীরা পরম ঐশ্বর্য এবং সমৃদ্ধি সহকারে বিরাজ করেন এবং অতি উচ্চ স্তরের ব্যক্তিদের উপযোগী বিমান ইত্যাদি সমস্ত সুযোগ-সুবিধা সেখানে রয়েছে। অতএব পরমেশ্বর ভগবান সৃষ্টির পূর্বেও বিরাজ করেন এবং সর্বপ্রকার চিন্ময় বৈচিত্র্য সহ তিনি বৈকুণ্ঠলোকে বিরাজ করেন।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও এই বৈকুণ্ঠলোককে সনাতন বলে বর্ণনা করা হয়েছে, অর্থাৎ জড় জগতের প্রলয় হলেও বৈকুণ্ঠলোকের বিনাশ হয় না। সেই সমস্ত চিন্ময় লোক সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির, এবং সেই প্রকৃতি জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। রাজার অস্তিত্বের সঙ্গে সঙ্গে যেমন তার রাজ্যের অস্তিত্বও সিদ্ধ হয়, তেমনই পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে বৈকুণ্ঠলোকের অস্তিত্বও স্বাভাবিকভাবে সিদ্ধ হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত আদি প্রামাণিক শাস্ত্রে বহু স্থানে পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৮/১০) মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করছেন—

*স চাপি যত্র পুরুষো বিশ্বস্থিত্যুদ্ভবাপ্যয়ঃ।*
*মুক্তাত্মমায়াং মায়েশঃ শেতে সর্বগুহাশয়ঃ॥*

কৃপা করে আপনি সেই পরমেশ্বর ভগবানের কথা বলুন যিনি পরমাত্মারূপেসকলের হৃদয়ে বিরাজ করেন এবং যিনি সমস্ত শক্তির ঈশ্বর হলেও তাঁর বহিরঙ্গা মায়াশক্তি যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। বিদুরও প্রশ্ন করেছেন—

*তত্ত্বানাং ভগবাংস্তেষাং কতিধা প্রতিসংক্রমঃ।*
*তত্রেমং ক উপাসীরন্ ক উস্বিদনুশেরতে॥* (ভাঃ ৩/৭/৩৭)

শ্রীধর স্বামী এর ব্যাখ্যা এইভাবে করেছেন, "সৃষ্টি যখন ধ্বংস প্রাপ্ত হয় সেই সময় শেষশায়ী ভগবানের সেবা কে করেন ইত্যাদি"। অর্থাৎ, ভগবান তাঁর নাম, যশ, গুণ এবং উপকরণসহ নিত্য বিরাজমান। স্কন্দ পুরাণের কাশী-খণ্ডের ধ্রুব চরিতে সেই তত্ত্ব প্রতিপন্ন হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে,

*ন চ্যবন্তেঽপি যদ্ভক্তা মহত্যাং প্রলয়াপদি।*
*অতোঽচ্যুতোঽখিলে লোকে স একঃ সর্বগোঽব্যয়ঃ ॥*

মহাপ্রলয়ে সমস্ত জগৎ ধ্বংস হলেও পরমেশ্বর ভগবানের ভক্তদের বিনাশ হয় না, অতএব ভগবানের কি কথা! ভগবান জড়া প্রকৃতির পরিবর্তনের তিনটি অবস্থাতে সর্বদাই বিদ্যমান থাকেন।

নির্বিশেষবাদীরা বলে যে ভগবান নিষ্ক্রিয়, কিন্তু ভগবান এবং ব্রহ্মার মধ্যে এখানে যে আলোচনা হয়েছে তাতে ভগবানকে ক্রিয়াশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং তাঁর রূপ ও গুণ রয়েছে। সৃষ্টির পালনের সময় ব্রহ্মা এবং অন্যান্য দেবতাদের যে কার্যকলাপ তা ভগবানেরই কার্যকলাপ বলে বুঝতে হবে। রাজা অথবা রাষ্ট্রপ্রধানকে সরকারী কার্যালয়ে দেখা নাও যেতে পারে, কেননা তিনি রাজকীয় বিলাসে মগ্ন। কিন্তু তা হলেও সবকিছুই তাঁরই নির্দেশনায় পরিচালিত হয় এবং সবকিছুই তাঁর অধীন।

পরমেশ্বর ভগবান কখনই নিরাকার নন। এই জড় জগতে অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের কাছে তাঁর সবিশেষ রূপ প্রকট না হতে পারে, তাই তাঁকে কখনো কখনো নিরাকার বলা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি তাঁর নিত্যরূপে বৈকুণ্ঠলোকে এবং এই ব্রহ্মাণ্ডের বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অবতাররূপে নিত্য প্রকাশিত। রাত্রিবেলায় মানুষ সূর্যকে দেখতে পায় না, কিন্তু যেখানে সূর্যোদয় হয়েছে সেখানে সূর্যকে দেখা যায়। পৃথিবীর বিশেষ কোন স্থানের মানুষ সূর্যকে যদি না দেখতে পায় তার অর্থ এই নয় যে সূর্য নেই।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১/৪/১) একটি মন্ত্র রয়েছে—*আত্মৈবেদমগ্রাসীৎ পুরুষ-বিধঃ*। এই মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে যে পরমেশ্বর ভগবান (শ্রীকৃষ্ণ) পুরুষাবতারে আবির্ভাবের পূর্বেও ছিলেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৫/১৮)উল্লেখ করা হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম, কেননা তিনি হচ্ছেন পরম পুরুষ, এমনকি পুরুষ-অক্ষর এবং পুরুষ-ক্ষরেরও অতীত। অক্ষর-পুরুষ বা মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ করেন এবং তার ফলে সমগ্র জড় জগৎ প্রকাশিত হয়, কিন্তু পুরুষোত্তম তারও পূর্বে বিরাজমান ছিলেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদে তাই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বর্ণনা প্রতিপন্ন হয়েছে যে শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন পুরুষোত্তম।

কোন কোন বেদে এও বলা হয়েছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে কেবল নির্বিশেষ ব্রহ্মের অস্তিত্ব ছিল। কিন্তু এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, নির্বিশেষ ব্রহ্ম, যা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ নির্গত রশ্মিচ্ছটা, তাকে আপাত কারণ বলা যেতে পারে, কিন্তু সর্বকারণের পরম কারণ হচ্ছেন পরমেশ্বর। এই জড় জগতেই কেবল ভগবানের নির্বিশেষ রূপের অস্তিত্ব রয়েছে, কেননা জড় ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা জড় চক্ষুর দ্বারা

ভগবানকে উপলব্ধি করা যায় না অথবা দর্শন করা যায় না। ভগবানকে দর্শন করতে হলে অথবা উপলব্ধি করতে হলে সর্বপ্রথমে ইন্দ্রিয়গুলিকে চিন্ময়ত্ব প্রদান করতে হবে। ভগবান তাঁর স্বরূপে নিত্য লীলা-বিলাস-পরায়ণ, এবং তিনি সাক্ষাৎভাবে বৈকুণ্ঠলোকের অধিবাসীদের কাছে নিত্য প্রকাশিত। তাই জড় দৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নির্বিশেষ, ঠিক যেমন সরকারী কার্যালয়ে রাষ্ট্রপ্রধান নির্বিশেষ হলেও রাজভবনে তিনি নির্বিশেষ নন। তেমনই ভগবান তাঁর ধামে নির্বিশেষ নন, যা সর্বদাই *নিরস্ত কুহকম্*, যা শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব ভগবানের নির্বিশেষ এবং সবিশেষ উভয় রূপকেই স্বীকার করা যায়, যা প্রামাণিক শাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় *ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্* শ্লোকে (১৪/২৭) ভগবানের সবিশেষত্ব বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

অতএব চিন্ময় জ্ঞানের সবচাইতে গুহ্যতম অংশ হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান, নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান নয়। তাই পরম তত্ত্বের সবিশেষ রূপকে জানাই জ্ঞানের চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত, নির্বিশেষ রূপ নয়। পরম তত্ত্বের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি করার ব্যাপারে ঘটের ভিতরের আকাশ এবং ঘটের বাহিরের আকাশের দৃষ্টান্ত উপযুক্ত হতে পারে, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে ভগবানের বিভিন্ন অংশ তাদের ভ্রান্ত দাবীর প্রভাবে পরমেশ্বর ভগবান হয়ে যেতে পারে। এটি হচ্ছে মায়ার চরম ফাঁস। দৈবী মায়ার শেষ ফাঁদ হচ্ছে ভগবানের আমিত্বে একাকার হয়ে যাওয়ার বাসনা। ভগবানের নির্বিশেষ অস্তিত্বেও, যা জড় সৃষ্টিতে প্রকাশিত, সকলের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সবিশেষ উপলব্ধির প্রচেষ্টা করা, এবং সেটি হচ্ছে *পশ্চাদহং যদেতচ্চ যোঽবশিষ্যেত সোঽস্ম্যহম্*-এর অর্থ।

নারদকে উপদেশ দেওয়ার সময় ব্রহ্মাজীও সেই সত্যকে স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—

*সোঽয়ং তেঽভিহিতস্তাত ভগবান্ বিশ্বভাবনঃ* (ভাঃ ২/৭/৫০)

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি ব্যতীত সর্বকারণের আর কোন কারণ নেই। তাই এইশ্লোকে *অহমেব* শব্দটি কখনোই পরমেশ্বর ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুর ইঙ্গিত করে না, এবং তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পন্থা অনুসরণ করা। অর্থাৎ ব্রহ্মা থেকে নারদ, নারদ থেকে ব্যাস আদি গুরু-শিষ্য-পরম্পরার ধারা অনুসরণ করা, এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি বা শ্রীকৃষ্ণকে উপলব্ধি করার প্রচেষ্টাকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে স্থির করা। শুদ্ধ ভক্তের প্রতি ভগবানের এই অতি গোপনীয় উপদেশ ভগবান অর্জুনকেও দিয়েছিলেন, এবং সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকেও দিয়েছেন। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ আদি দেবতারা নিঃসন্দেহে বিভিন্ন কার্য সম্পাদনের জন্য ভগবানের বিভিন্ন রূপ। সৃষ্টির বিভিন্ন উপাদান এবং বিভিন্ন শক্তি ভগবানের বিভিন্ন প্রকাশ হলেও তাদের মূল উৎস হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে শাখা-প্রশাখার দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে বৃক্ষের মূলের প্রতি আসক্ত হওয়া। এই শ্লোকে সেই উপদেশই দেওয়া হয়েছে।

## শ্লোক ৩৪

**ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত ন প্রতীয়েত চাত্মনি।**
**তদ্বিদ্যাদাত্মনো মায়াং যথাভাসো যথা তমঃ ॥ ৩৪ ॥**

**ঋতে**—বিনা; **অর্থম্**—মূল্য; **যৎ**—যা; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **ন**—না; **প্রতীয়েত**—প্রতীয়মান হয়; **চ**—এবং; **আত্মনি**—আমার সম্পর্কে; **তৎ**—তা; **বিদ্যাৎ**—তোমার জানা অবশ্য কর্তব্য; **আত্মনঃ**—আমার; **মায়াম্**—মায়া; **যথা**—যেমন; **আভাসঃ**—প্রতিবিম্ব; **যথা**—যেমন; **তমঃ**—অন্ধকার।

## অনুবাদ

**হে ব্রহ্মা! আমার সঙ্গে সম্পর্করহিত যদি কোন কিছু অর্থপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা হলে তার কোন বাস্তবতা নেই। তাকে আমার মায়া বলে জেনো, যা হচ্ছে অন্ধকারে প্রতিবিম্বের মতো।**

## তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে ইতিমধ্যে নির্ণীত হয়েছে যে সৃষ্টির প্রতিটি স্তরেই—উৎপত্তি, পালন, বৃদ্ধি, বিভিন্ন শক্তির প্রতিক্রিয়া, ক্ষয় এবং ধ্বংস সবই ভগবানের অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কিত, এবং যখন ভগবানের সঙ্গে এই মূল সম্পর্কের বিস্মৃতি হয় এবং ভগবানের সঙ্গে সম্পর্করহিত হওয়া সত্ত্বেও তাকে বাস্তব বলে মনে করা হয়, তা হচ্ছে ভগবানের মায়া।

যেহেতু ভগবান ব্যতীত কোনকিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না, তাই জানতে হবে যে মায়াও ভগবানের শক্তি। প্রত্যেক বস্তুকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কিত করার যথার্থ সিদ্ধান্তকে বলা হয় যোগমায়া বা যুক্ত করার শক্তি, এবং ভগবানের সম্পর্ক থেকে বিচ্যুত করার ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় ভগবানের দৈবী মায়া বা মহামায়া। উভয় মায়াই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, কেননা ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কোন কিছুর অস্তিত্ব থাকতে পারে না। তাই ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছেদের ভ্রান্ত ধারণা মিথ্যা নয়, কিন্তু মায়িক।

কোন বস্তুকে অন্য বস্তু বলে মনে করাকে বলা হয় ভ্রম। যেমন রজ্জুকে সর্প বলে মনে করা ভ্রম, কিন্তু রজ্জু মিথ্যা নয়। ভ্রমাচ্ছন্ন ব্যক্তির সম্মুখস্থ রজ্জুটি মিথ্যা নয়, কিন্তু তার সম্পর্কীয় ধারণাটি ভ্রান্ত। তেমনই জড় সৃষ্টিকে ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে মনে করার ভ্রান্ত ধারণা হচ্ছে মায়া, কিন্তু তা বলে তা মিথ্যা নয়। এই ভ্রান্ত ধারণাকে বলা হয় অজ্ঞানের অন্ধকারে বাস্তবের প্রতিবিম্ব। ভগবান বলেছেন যা কিছু আমার শক্তিসম্ভূত নয় বলে প্রতীত হয়, তাকে বলা হয় মায়া। জীবকে অথবা পরমেশ্বর ভগবানকে নিরাকার বলে মনে করার ধারণাও মায়া।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (২/১২) ভগবান অর্জুনকে বলেছেন যে সেই রণক্ষেত্রে অর্জুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান সমস্ত যোদ্ধাগণ, অর্জুন স্বয়ং এবং ভগবান স্বয়ং পূর্বে ছিলেন, কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে তাঁরা বর্তমান এবং তাঁদের বর্তমান শরীর ধ্বংস হলেও, এমনকি জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে গেলেও, তাঁদের সকলেরই অস্তিত্ব থাকবে। সর্বাবস্থাতেই ভগবান এবং জীব স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, এবং ভগবান এবং জীব উভয়েরই স্বরূপ কখনও ধ্বংস হয় না; কেবল ভগবানের কৃপায় মায়ার প্রভাব বা অন্ধকারে আলোকের প্রতিবিম্ব অপসারিত হতে পারে।

জড় জগতে সূর্যের আলোক স্বতন্ত্র নয়, তেমনই চন্দ্রের কিরণও নয়। আলোকের প্রকৃত উৎস হচ্ছে ব্রহ্মজ্যোতি, যা ভগবানের অপ্রাকৃত দেহনির্গত রশ্মিচ্ছটা। সেই রশ্মিচ্ছটা বিভিন্ন জ্যোতির্ময় বস্তুতে প্রতিফলিত হয়—সূর্যের কিরণরূপে, চন্দ্রের আলোকরূপে, অগ্নির জ্যোতিতে অথবা বিদ্যুতের প্রকাশে। অতএব আত্মাকে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন বলে মনে করাও মায়া। এই মায়া বা ভগবানের বহিরঙ্গা শক্তির চরম প্রকাশ হচ্ছে নিজেকে পরমেশ্বর বলে মনে করা, অথবা "*অহং ব্রহ্মাস্মি*"—এর ভ্রান্ত ধারণা।

বেদান্ত-সূত্রের শুরুতে প্রতিপন্ন হয়েছে যে সবকিছু পরমেশ্বর ভগবান থেকে উদ্ভূত হয়েছে। পূর্ববর্তী শ্লোকেও সে সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে, যে সমস্ত স্বতন্ত্র জীবের সৃষ্টি হয়েছে পরমপুরুষ পরমেশ্বর ভগবানের শক্তি থেকে। ব্রহ্মাও ভগবানের শক্তিজাত, এবং অন্য সমস্ত জীবেরাও ব্রহ্মার মাধ্যমে ভগবানের শক্তি থেকে উদ্ভূত। পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক ব্যতীত কারোরই কোন অস্তিত্ব থাকতে পারে না।

প্রতিটি জীবের যে স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা বাস্তবিক স্বাতন্ত্র্য নয়, পক্ষান্তরে তা হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের প্রকৃত স্বাতন্ত্র্যের প্রতিবিম্ব। বদ্ধ জীবের পরম স্বতন্ত্র হওয়ার ভ্রান্ত দাবী হচ্ছে মায়া,এবং এই শ্লোকে সেই সিদ্ধান্ত স্বীকার করা হয়েছে।

অল্পজ্ঞ ব্যক্তিরা মায়াচ্ছন্ন হয়, এবং তাই তথাকথিত বৈজ্ঞানিক, দেহতত্ত্ববিদ্, দার্শনিকেরা সূর্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ ইত্যাদির প্রতিবিম্বিত আলোকের দ্বারা বিভ্রান্ত হয়ে জড় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি এবং বিনাশ সম্বন্ধে নানা প্রকার জল্পনা-কল্পনাপ্রসূত মতবাদ উপস্থাপন করে ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে। চিকিৎসকেরা দেহের অতীত আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে পারে, কিন্তু তারা কখনো কোন মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না, যদিও মৃত্যুর পরেও দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বর্তমান থাকে। মনোবিজ্ঞানীরা মস্তিষ্কের গঠনমূলক অবস্থা সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এবং তারা মনে করে যে মস্তিষ্কের পিণ্ডটি হচ্ছে মনের কার্যকলাপের যন্ত্র, কিন্তু কোন মৃতদেহে তারা মনের কার্যকলাপ ফিরিয়ে আনতে পারে না।

ভগবানের সঙ্গে সম্পর্করহিত জড় সৃষ্টির অথবা জড় দেহের এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন কেবল প্রতিবিম্বিত বুদ্ধিমত্তার কসরত মাত্র, কিন্তু চরমে তা সবই ভ্রান্ত। জড়

সভ্যতার এই প্রকার তথাকথিত বৈজ্ঞানিক প্রগতি হচ্ছে মায়ার আবরণাত্মিকা শক্তির ক্রিয়া।

মায়ার দুই প্রকার শক্তি রয়েছে, যথা আবরণাত্মিকা শক্তি এবং বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি। বিক্ষেপাত্মিকা শক্তির দ্বারা মায়া জীবকে অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে এবং আবরণাত্মিকা শক্তির দ্বারা মায়া অজ্ঞানের আবরণে জীবের জ্ঞানচক্ষু আচ্ছাদিত করে, যার ফলে তারা পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব বিস্মৃত হয়, যে ভগবান সর্বশ্রেষ্ঠ জীব ব্রহ্মাকে জ্ঞানের আলোক প্রদান করেছিলেন।

এখানে ব্রহ্মা এবং পরমেশ্বর ভগবানের অস্তিত্ব এক বলে কখনো দাবী করা হয়নি, এবং তাই মূর্খ মানুষদের এই প্রকার ভ্রান্ত দাবী ভগবানের মায়ারই আর একটি প্রকাশ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৬/১৮-২০) ভগবান বলেছেন, যে সমস্ত আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবানের অস্তিত্ব অস্বীকার করে তারা গভীর থেকে গভীরতর অজ্ঞানের অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হয় এবং এইভাবে এই প্রকার আসুরিক ব্যক্তিরা ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানরহিত হয়ে নানা যোনি ভ্রমণ করে।

কিন্তু সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষেরা, স্বয়ং ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট ব্রহ্মাজীর পরম্পরা ধারায় অথবা ভগবান কর্তৃক শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার জ্ঞান প্রাপ্ত অর্জুনের পরম্পরা ধারায় জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হন। তাঁরা ভগবানের এই বাণী স্বীকার করেন—

*অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।*
*ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥*

ভগবান হচ্ছেন সমস্ত সৃষ্টির আদি উৎস এবং সবকিছুই তাঁরই শক্তির আশ্রয়ে আশ্রিত। যে সুস্থ মস্তিষ্কসম্পন্ন মানুষ তা জানেন তিনি হচ্ছেন প্রকৃতজ্ঞানী এবং তাই তিনি ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হয়ে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হন।

যদিও অল্পজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছে ভগবানের প্রতিবিম্বক শক্তি নানাপ্রকার ভ্রম উৎপন্ন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান ব্যক্তি স্পষ্টভাবে জানেন যে আমাদের দৃষ্টির বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ভগবান তাঁর বিভিন্ন শক্তির দ্বারা ক্রিয়া করতে পারেন, ঠিক যেমন বহু দূরে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও অগ্নি আলোক এবং তাপ বিকিরণ করে। প্রাচীন ঋষিরা আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্ব স্বীকার করে বর্ণনা করেছেন—

*জগদযোনেরনিচ্ছস্য চিদানন্দৈকরূপিণঃ।*
*পুংসোঽস্তি প্রকৃতির্নিত্যা প্রতিচ্ছায়েব ভাস্বতঃ ॥*
*অচেতনাপি চৈতন্যযোগেন পরমাত্মনঃ।*
*অকরোদ্বিশ্বমখিলম্ অনিত্যম্ নাটকাকৃতিম্ ॥*

এক পরম পুরুষ রয়েছেন যিনি এই জগতের স্রষ্টা এবং তাঁর শক্তি পরা প্রকৃতির চোখ-ধাঁধানো প্রতিফলন জড়া প্রকৃতিরূপে ক্রিয়াশীল। প্রকৃতির এই প্রকার মায়িক ক্রিয়ার ফলে অচেতন জড় পদার্থ সক্রিয় হয় ভগবানের জীবশক্তির সহযোগিতায়, এবং

তমসাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এই জড় জগৎ একটি নাটকের মতো প্রতিভাত হয়। তাই, মূর্খ ব্যক্তিরা, তা সে বৈজ্ঞানিকই হোক অথবা দেহতত্ত্ববিদই হোক, প্রকৃতির এই নাটককে বাস্তব বলে মনে করে।

কিন্তু প্রকৃতিস্থ মানুষ জানেন যে এই প্রকৃতি হচ্ছে ভগবানের মায়া। এই প্রকার সিদ্ধান্তের দ্বারা, যা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে, স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে জীবও ভগবানের পরা প্রকৃতির প্রকাশ, কিন্তু জড় জগৎ হচ্ছে তার অপরা প্রকৃতির প্রদর্শন। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে পার্থক্য যদিও অতি অল্প, তথাপি ভগবানের পরা প্রকৃতি ভগবানের সমতুল্য নয়, ঠিক যেমন আগুনের শক্তি তাপ আগুনের সমতুল্য নয়।

এই সরল সত্যটি অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা বুঝতে পারে না, যারা ভ্রান্তভাবে দাবী করে যে তাপ এবং আগুন এক। আগুনের এই শক্তিকে (যথা তাপ) এখানে প্রতিবিম্ব বলে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, এবং তা সরাসরিভাবে আগুন নয়।

তাই জীব বা জৈব শক্তি ভগবানের প্রতিবিম্ব এবং তা কখনোই স্বয়ং ভগবান নয়। ভগবানের প্রতিবিম্ব হওয়ার ফলে জীবের অস্তিত্ব পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল, যিনি হচ্ছেন প্রকৃত আলোক। এই জড়া প্রকৃতিকে অন্ধকারের সঙ্গে তুলনা করা যায়, এবং এই অন্ধকার জগতে জীবের কার্যকলাপ হচ্ছে সেই প্রকৃত আলোকের প্রতিফলন।

এই শ্লোকের বিষয় বস্তুর পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানকে জানা উচিত। এই উভয় শক্তিই যখন ভগবানের উপর নির্ভর করে না, তখন তা হচ্ছে মায়া। আলোকের প্রতিফলনের দ্বারা অজ্ঞানের অন্ধকারের সমাধান হয় না। তেমনই সাধারণ মানুষ কর্তৃক প্রতিফলিত আলোকের দ্বারা কেউই জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে পারে না; তাকে প্রকৃত আলোকের উৎস থেকে আলোকপ্রাপ্ত হতে হয়। অন্ধকারে সূর্যের আলোকের প্রতিফলন অন্ধকার দূর করতে পারে না, কিন্তু সেই প্রতিফলনের পিছনে যে সূর্যের আলোক রয়েছে তা সম্পূর্ণরূপে অন্ধকার দূর করতে পারে। অন্ধকারে কেউই কোন কিছু দর্শন করতে পারে না। তাই অন্ধকারে মানুষ সাপ, বিছা ইত্যাদির ভয়ে ভীত হয়, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেগুলি সেখানে নাও থাকতে পারে। কিন্তু আলোকের দ্বারা ঘরের সব কিছুই স্পষ্টভাবে দেখা যায় এবং সাপ ও বিছার ভয় তৎক্ষণাৎ দূর হয়ে যায়। তাই ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত আলোকের আশ্রয় গ্রহণ করতে হবে, যা তিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রদান করেছেন, এবং কখনোই প্রতিবিম্বস্বরূপ ব্যক্তিদের আশ্রয়গ্রহণ করা উচিত নয় যাদের ভগবানের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। যারা ভগবানের অস্তিত্ব বিশ্বাস করে না তাদের কাছ থেকে কখনোই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করা উচিত নয়। এই প্রকার ব্যক্তিরা অত্যন্ত হতভাগ্য, এবং যারা তাদের সঙ্গ করে তাদেরও সর্বনাশ হয়।

পদ্ম পুরাণের বর্ণনা অনুসারে, জড় জগতের অসংখ্য জড় ব্রহ্মাণ্ড রয়েছে এবং সেগুলি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ব্রহ্মা থেকে শুরু করে (অসংখ্য ব্রহ্মাণ্ডে অগণিত ব্রহ্মা রয়েছে)

একটি নগণ্য পিপীলিকা পর্যন্ত সমস্ত জীবই অন্ধকারে জন্মগ্রহণ করেছে, এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবানকে দর্শন করতে হলে তাদের প্রকৃত আলোকের প্রয়োজন, ঠিক যেমন সূর্যের আলোকের দ্বারাই কেবল সূর্যকে দর্শন করা যায়। কোন প্রদীপ বা জড় দীপবর্তিকা, তা যত শক্তিশালীই হোক না কেন, সূর্যকে দর্শন করাতে সাহায্য করতে পারে না। সূর্য নিজেই নিজেকে প্রকাশ করে।

তাই ভগবানের বিভিন্ন শক্তির ক্রিয়া অথবা স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানকে, ভগবানের অহৈতুকী করুণার দ্বারা প্রকাশিত আলোকের দ্বারাই কেবল উপলব্ধি করা যায়। নির্বিশেষবাদীরা বলে যে ভগবানকে দেখা যায় না। ভগবানকে ভগবানের আলোকের দ্বারাই দেখা যায়, মানুষের জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে নয়। এখানে এই আলোককে *বিদ্যাৎ* বলে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা ব্রহ্মার প্রতি ভগবানের একটি প্রত্যাদেশ। ভগবানের এই প্রত্যক্ষ আদেশটি তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তির প্রকাশ, এবং এই বিশেষ শক্তিটি সরাসরিভাবে ভগবানকে দর্শন করার উপায়। কেবল ব্রহ্মাই নন, যিনিই ভগবানের কৃপায় প্রত্যক্ষভাবে এই অন্তরঙ্গা শক্তিকে দর্শন করেছেন, তিনি কোনপ্রকার মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনা ব্যতীতই পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করতে পারেন।

## শ্লোক ৩৫

**যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষুচ্চাবচেষ্বনু।**
**প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু ন তেষ্বহম্ ॥ ৩৫ ॥**

**যথা**—ঠিক যেমন; **মহান্তি**—ব্রহ্মাণ্ড; **ভূতানি**—পঞ্চ মহাভূত; **ভূতেষু-উচ্চ-অবচেষু**—অণু তথা বিরাটে; **অনু**—পরে; **প্রবিষ্টানি**—প্রবিষ্ট হয়ে; **অপ্রবিষ্টানি**—প্রবিষ্ট নয়; **তথা**—তেমন; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **ন**—না; **তেষু**—তাদের মধ্যে; **অহম্**—আমি স্বয়ং।

## অনুবাদ

**হে ব্রহ্মা, জেনে রেখ যে মহাভূতসমূহ যেমন উচ্চনীচ সমস্ত সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েও অপ্রবিষ্টরূপে স্বতন্ত্রভাবে বর্তমান, তেমনই আমিও জগতে সর্বভূতে প্রবিষ্ট হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেক বস্তু থেকে পৃথক থাকি।**

## তাৎপর্য

ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ এবং ব্যোম, জড় জগতের এই মহাভূতসমূহ সমুদ্র, পর্বত, জলচর, উদ্ভিদ, সরীসৃপ, পক্ষী, পশু, মনুষ্য, দেবতা এবং জড় জগতের সব কিছুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও এই সমস্ত উপাদানগুলি পৃথকভাবে বর্তমান। উন্নত স্তরের চেতনাসম্পন্ন মানুষ দেহতত্ত্ব-বিজ্ঞান এবং ভৌতিক বিজ্ঞান উভয়ই অধ্যয়ন করতে পারে, কিন্তু এই প্রকার বিজ্ঞানের মূল সিদ্ধান্ত জড় উপাদানের অতিরিক্ত আর

কিছু নয়। মানুষের শরীর, পর্বতের শরীর এবং ব্রহ্মা আদি দেবতাদের শরীর, সব কিছুই মাটি, জল ইত্যাদি উপাদানের দ্বারা গঠিত, এবং তা সত্ত্বেও এই সমস্ত উপাদানগুলি দেহের বাইরেও রয়েছে। এই সমস্ত উপাদানগুলি প্রথমে সৃষ্টি হয়েছিল, এবং তাই তারা পরে শরীর গঠনের সময় শরীরে প্রবেশ করেছে। কিন্তু উভয় অবস্থাতেই তারা সৃষ্টিতে প্রবিষ্ট হয়েছে, আবার সেই সঙ্গে প্রবিষ্ট হয়ওনি। তেমনই পরমেশ্বর ভগবান তাঁর অন্তরঙ্গা এবং বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা জগতের প্রতিটি বস্তুর অন্তরে বিরাজমান, আবার সেই সঙ্গে তিনি সব কিছুর বাইরে, তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠ লোকে নিত্য বিরাজমান, যা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৭) তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—

*আনন্দচিন্ময়রসপ্রতিভাবিতাভি—*
*স্তাভির্য এব নিজরূপতয়া কলাভিঃ।*
*গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর অন্তরঙ্গা সচ্চিদানন্দ শক্তির বিস্তারের দ্বারা বহু রূপে তাঁর অংশ এবং কলায় নিজেকে বিস্তার করে আনন্দ আস্বাদন করেন। গোলোক বৃন্দাবন নামক তাঁর নিত্যধামে নিত্য বিরাজমান হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রতিটি পরমাণুর অন্তরেও বিরাজমান।"

সেই ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৫) তাঁর অংশের বিস্তার অধিক বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে—

*একোঽপ্যসৌ রচয়িতুং জগদণ্ডকোটিং*
*যচ্ছক্তিরস্তি জগদণ্ডচয়া যদন্তঃ।*
*অণ্ডান্তরস্থপরমাণুচয়ান্তরস্থং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

"আমি পরমেশ্বর ভগবান গোবিন্দের ভজনা করি, যিনি তাঁর এক অংশের দ্বারা প্রতিটি ব্রহ্মাণ্ড এবং প্রতিটি পরমাণুতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, এইভাবে তিনি সমগ্র সৃষ্টিতে তাঁর অনন্ত শক্তি প্রকাশ করেছেন।"

নির্বিশেষবাদীরা কল্পনা করতে পারে অথবা অনুভবও করতে পারে যে পরব্রহ্ম এইভাবে সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তারা সিদ্ধান্ত করে যে তাঁর কোন সবিশেষরূপ থাকা সম্ভব নয়। এটিই ভগবানের দিব্য জ্ঞানের রহস্য। এই রহস্যটি হচ্ছে দিব্য ভগবৎ-প্রেম, এবং যিনি এই দিব্য ভগবৎ-প্রেমে আপ্লুত হয়েছেন, তিনি অনায়াসে প্রতিটি পরমাণুতে এবং স্থাবর অথবা জঙ্গম সমস্ত বস্তুতে পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করতে পারেন। আবার সেই সঙ্গে তিনি ভগবানকে তাঁর নিত্যধাম গোলোকে তাঁর চিন্ময় সত্তার বিস্তারস্বরূপ নিত্য পার্ষদদের সঙ্গে নিত্য আনন্দ আস্বাদন করতে দেখতে পান। এই দৃষ্টি দিব্যজ্ঞানের

প্রকৃত রহস্য, যা ভগবান শুরুতে উল্লেখ করেছেন (*সরহস্যং তদঙ্গং চ*)। এই রহস্যটি হচ্ছে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞানের সবচাইতে গোপনীয় বিষয়, এবং মনোধর্মী জ্ঞানীদের পক্ষে জল্পনা-কল্পনার কসরতের মাধ্যমে তা আবিষ্কার করা কখনোই সম্ভব নয়। ব্রহ্ম-সংহিতায় (৫/৩৮) ব্রহ্মাজী যে পন্থা অনুমোদন করেছেন, তার মাধ্যমে সেই রহস্য উন্মোচিত হতে পারে—

*প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিবিলোচনেন*
*সন্তঃ সদৈব হৃদয়েষু বিলোকয়ন্তি।*
*যং শ্যাম সুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি।।*

"আমি আদি পুরুষ গোবিন্দের ভজনা করি, যাঁকে ভগবৎ-প্রেম-রূপী অঞ্জনের দ্বারা রঞ্জিত দৃষ্টিতে শুদ্ধ ভক্তরা সর্বদাই তাঁদের হৃদয়ে দর্শন করতে পারেন। এই গোবিন্দ হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণাবলী সমন্বিত আদি পুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্যামসুন্দর।"

তাই যদিও তিনি প্রতিটি পরমাণুতে বিরাজমান, শুষ্ক জ্ঞানীরা তাঁকে দর্শন করতে পারে না ; কিন্তু শুদ্ধ ভক্তদের দৃষ্টিতে সেই রহস্যের যবনিকা উন্মোচিত হয়, কেননা তাঁদের চক্ষু ভগবৎ-প্রেমের দ্বারা রঞ্জিত। এই ভগবৎ-প্রেম কেবল অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের মাধ্যমেই লাভ করা যায়, অন্য কোন উপায়ে তা সম্ভব নয়।

ভগবদ্ভক্তের দৃষ্টিভঙ্গী সাধারণ নয় ; তা ভগবদ্ভক্তির পন্থায় পবিত্র। পক্ষান্তরে বলা যায়, জগতের মহাভূতসমূহ যেমন সমস্ত বস্তুর ভিতরে এবং বাইরে উভয় অবস্থাতেই রয়েছে, তেমনই ভগবানের নাম, রূপ, গুণ, লীলা, পরিকর ইত্যাদিও শাস্ত্রে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে অথবা জড় সৃষ্টি থেকে বহু বহু দূরে বৈকুণ্ঠলোকে যেভাবে বিরাজ করছে, তা বাস্তবিকভাবে ভগবদ্ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হয়। মূর্খ মানুষেরা সে কথা বুঝতে পারে না, যদিও তারা দেখে যে জড় বিজ্ঞানের সাহায্যে দূরদর্শনের মাধ্যমে দূরের বস্তুকে দর্শন করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, যে ব্যক্তির চিন্ময় চেতনা বিকশিত হয়েছে, তিনি তাঁর হৃদয়পটে সর্বদা দূরদর্শনের মতো ভগবদ্ধামের প্রতিফলন দর্শন করতে পারেন। সেটিই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধীয় জ্ঞানের রহস্য।

ভগবান যে কোন ব্যক্তিকে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্তিদান করতে পারেন, কিন্তু তিনি কদাচিৎ কাউকে ভগবৎ-প্রেম দান করেন। এই সত্য প্রতিপন্ন করে নারদমুনি বলেছেন, "*মুক্তিং দদাতি কর্হিচিৎ স্ম ন ভক্তিযোগম্*"। এই অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তি এতই অদ্ভুত যে তার বৃত্তি উপযুক্ত ভক্তের মনকে সর্বদা চিন্ময় কার্যকলাপে মগ্ন রাখে এবং এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানের সংসর্গ থেকে বিচ্যুত হতে দেয় না। এইভাবে ভক্তের হৃদয়ে যে ভগবৎ-প্রেম বিকশিত হয়, তা হচ্ছে এক মহান রহস্য। ব্রহ্মাজী পূর্বে নারদকে বলেছেন যে ব্রহ্মার বাসনা কখনো অপূর্ণ থাকে না, কেননা তিনি সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় মগ্ন ; এবং তাঁর হৃদয়ে ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা ব্যতীত আর অন্য কোন বাসনা নেই। এটিই হচ্ছে ভক্তিযোগের সৌন্দর্য এবং রহস্য।

ভগবান অচ্যুত বলে তাঁর বাসনাও যেমন অচ্যুত, তেমনই ভগবদ্ভক্তের ভগবানকে সেবা করার অপ্রাকৃত বাসনাও অচ্যুত। কিন্তু তা একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা অত্যন্ত কঠিন যদি না সে ভগবদ্ভক্তির রহস্য সম্বন্ধে অবগত হয়; ঠিক যেমন পরশ পাথরের অচিন্ত্য শক্তি সাধারণ মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। পরশ পাথর যেমন দুর্লভ, তেমনই ভগবানের শুদ্ধভক্তের দর্শনও দুর্লভ। এমনকি কোটি মুক্তদের মধ্যেও একজন কৃষ্ণভক্ত খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। জ্ঞানের মাধ্যমে যে সমস্ত সিদ্ধি লাভ হয়, ভগবদ্ভক্তি-যোগের সিদ্ধি তার থেকেও শ্রেষ্ঠ, এবং তা অত্যন্ত রহস্যাবৃতও। তা অষ্টাঙ্গযোগের অষ্টসিদ্ধির থেকেও অধিক রহস্যজনক। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১৮/৬৪) ভগবান অর্জুনকে এই ভক্তিযোগ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে বলেছেন—

*সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।*

"পুনরায় তুমি ভগবদ্গীতার সবচাইতে গুহ্যতম তত্ত্ব আমার কাছে শ্রবণ কর।" সেই সত্য প্রতিপন্ন করে ব্রহ্মাজীও নারদকে বলেছেন—

*ইদং ভাগবতং নাম যন্মে ভগবতোদিতম্।*
*সংগ্রহোঽয়ং বিভূতীনাং ত্বমেতদ্ বিপুলীকুরু॥*

ব্রহ্মাজী নারদকে বললেন, "ভাগবত সম্বন্ধে আমি তোমাকে যা কিছু বলেছি তা পরমেশ্বর ভগবান আমার কাছে বিশ্লেষণ করেছেন, এবং আমি তোমাকে নির্দেশ দিচ্ছি খুব সুন্দরভাবে তা তুমি বিস্তার কর যাতে মানুষ ভগবানের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবা সম্পাদন করার মাধ্যমে অনায়াসে ভক্তিযোগের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।"

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় এই যে ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মার কাছে ভক্তিযোগের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন। কেউ যদি দিব্য গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন, তা হলে তিনি অবশ্যই ভগবান এবং শব্দরূপে তাঁর অবতার শ্রীমদ্ভাগবতের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পাবেন।

## শ্লোক ৩৬

**এতাবদেব জিজ্ঞাস্যং তত্ত্বজিজ্ঞাসুনাত্মনঃ।**
**অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং যৎ স্যাৎ সর্বত্র সর্বদা॥ ৩৬॥**

**এতাবৎ**—এই পর্যন্ত; **এব**—নিশ্চয়ই; **জিজ্ঞাস্যম্**—জিজ্ঞাস্য; **তত্ত্ব**—পরম সত্য; **জিজ্ঞাসুনা**—বিদ্যার্থী কর্তৃক; **আত্মনঃ**—আত্মার; **অন্বয়**—প্রত্যক্ষভাবে; **ব্যতিরেকাভ্যাম্**—পরোক্ষভাবে; **যৎ**—যা কিছু; **স্যাৎ**—হতে পারে; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে এবং সর্বকালে; **সর্বদা**—সর্বাবস্থায়।

## অনুবাদ

**যে ব্যক্তি পরম সত্যরূপ আমার অনুসন্ধান করে, তাকে অবশ্যই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে সর্বস্থানে, সর্বকালে এবং সর্বাবস্থায় এই বিষয়ে পরিপ্রশ্ন করতে হবে।**

## তাৎপর্য

পূর্ববর্তী শ্লোকে যেভাবে ভক্তিযোগের রহস্য উন্মোচনের বিশ্লেষণ করা হয়েছে, সেটিই হচ্ছে সমস্ত জিজ্ঞাসার পরম স্তর অথবা জিজ্ঞাসুর পরম লক্ষ্য। কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ধ্যানযোগ, রাজযোগ, ভক্তিযোগ আদি বিভিন্ন যোগের মাধ্যমে বিভিন্নভাবে সকলেই আত্ম-উপলব্ধির অন্বেষণ করছে। উন্নত চেতনাসম্পন্ন প্রতিটি জীবেরই কর্তব্য হচ্ছে আত্ম-উপলব্ধির ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া। উন্নত চেতনাসম্পন্ন মানুষেরা স্বাভাবিকভাবে আত্মার রহস্য সম্বন্ধে, সৃষ্টি সম্বন্ধে, জীবনের সমস্যা সম্বন্ধে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধার্মিক, নৈতিক ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের রহস্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করে। কিন্তু এখানে সেই সমস্ত জিজ্ঞাসার পরম লক্ষ্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

বেদান্ত-সূত্রের শুরু হয় জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধানের মাধ্যমে, আর শ্রীমদ্ভাগবত সেই সমস্ত অনুসন্ধানের অথবা সমস্ত জিজ্ঞাসার রহস্যের উত্তর প্রদান করে। ব্রহ্মা পরমেশ্বর ভগবানের কাছ থেকে পূর্ণরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হতে চেয়েছিলেন, এবং এখানে ভগবান *অহমেব* থেকে শুরু করে এই শ্লোকের *এতাবৎ* অবধি চারটি শ্লোকের মাধ্যমে তার উত্তর দিয়েছেন। এটিই হচ্ছে আত্মতত্ত্ব-উপলব্ধির সমস্ত পন্থার সমাপ্তি।

অন্ধকারে চোখ ঝলসানো আলোকের প্রতিফলনের ফলে মানুষ জানে না যে জীবনের পরম লক্ষ্য হচ্ছে শ্রীবিষ্ণু বা পরমেশ্বর ভগবান। সকলেই অসংযত ইন্দ্রিয় কর্তৃক ধাবিত হয়ে জড় অস্তিত্বের অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রদেশে প্রবেশ করছে। মৈথুন আকাঙ্ক্ষাভিত্তিক বাসনাপ্রসূত ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের স্পৃহা থেকে সমগ্র জড় জগতের উদ্ভব হয়েছে, এবং তার ফলে জ্ঞানের এত উন্নতি সাধন সত্ত্বেও জীবের সমস্ত কার্যকলাপের চরম লক্ষ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি সাধন।

কিন্তু এখানে জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য সম্বন্ধে আমাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, এবং সকলেরই কর্তব্য হচ্ছে ভক্তিযোগের বিজ্ঞানে পারদর্শী সদ্গুরুর কাছে অথবা এই জড় জগতে প্রকট ভক্ত-ভাগবতের কাছে প্রশ্ন করার মাধ্যমেএই বিষয় অবগত হওয়া।

সকলেই বিভিন্ন প্রকার শাস্ত্রীয় প্রশ্নের অনুসন্ধান করছে, কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত আত্মতত্ত্বজ্ঞানের সমস্ত শিক্ষার্থীদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর প্রদান করেছেন ঃ কঠোর পরিশ্রম অথবা অধ্যবসায় ব্যতীত জীবনের এই পরম লক্ষ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। যার হৃদয়ে ঐকান্তিকভাবে এই সমস্ত প্রশ্নের উদয় হয়েছে, তার অবশ্য কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মাজীর পরম্পরায় সদ্গুরুর কাছে সেই তত্ত্ব সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা, এবং সেই নির্দেশই এখানে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সেই রহস্য ব্রহ্মার কাছে পরমেশ্বর ভগবান প্রকাশ করেছিলেন, তাই আত্মতত্ত্বের রহস্য সম্বন্ধীয় সমস্ত প্রশ্ন অবশ্যই এই প্রকার গুরু-পরম্পরার ধারায় স্বীকৃত ভগবানের প্রতিনিধিস্বরূপ সদ্গুরুর কাছে উপস্থাপন করা উচিত।

এইপ্রকার সদ্‌গুরু প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে শাস্ত্রের প্রমাণের মাধ্যমে সবকিছু প্রকাশ করতে পারেন। যদিও সকলেই শাস্ত্র আলোচনা করতে পারে, কিন্তু তবুও শাস্ত্রের নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করার জন্য সদ্‌গুরুর পরিচালনার প্রয়োজন রয়েছে, এবং এই শ্লোকে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। সদ্‌গুরু হচ্ছেন ভগবানের সবচাইতে অন্তরঙ্গ প্রতিনিধি এবং ব্রহ্মাজী যেভাবে পরমেশ্বর ভগবানের নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন, সেইভাবেই সদ্‌গুরুর কাছ থেকে নির্দেশ গ্রহণ করা অবশ্য কর্তব্য।

গুরু-পরম্পরার ধারায় যে সদ্‌গুরু, তিনি কখনো নিজেকে ভগবান বলে দাবী করেন না ; যদিও এইপ্রকার সদ্‌গুরু ভগবানের থেকেও মহৎ, কেননা তিনি তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে ভগবানকে অন্যের কাছে দান করতে সক্ষম। অধ্যয়নের দ্বারা অথবা মেধার দ্বারা কখনো ভগবানকে পাওয়া যায় না, কিন্তু সদ্‌গুরুর মাধ্যমে নিষ্ঠাবান শিষ্য অবশ্যই তাঁকে প্রাপ্ত হন।

সেই লক্ষ্য সম্বন্ধে শাস্ত্র সরাসরিভাবে নির্দেশ দেয়, কিন্তু মোহাচ্ছন্ন জীবেরা অন্ধকারে চোখ ঝলসানো প্রতিবিম্বের প্রভাবে অন্ধ হয়ে সৎ শাস্ত্রের এই সত্যকে খুঁজে পায় না। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চরম লক্ষ্য হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, কিন্তু ব্রহ্মাজী অথবা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার শ্রোতা অর্জুনের মতো সদ্‌গুরু কর্তৃক শিক্ষিত না হওয়ার ফলে বহু অযোগ্য ব্যক্তি তাদের খেয়ালখুশি মতো এই দিব্য জ্ঞানকে বিকৃত করে।

নিঃসন্দেহে চিদাকাশের দিগন্তে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হচ্ছে সবচাইতে উজ্জ্বল একটি তারকা, তথাপি এই মহান শাস্ত্রগ্রন্থটি এমনইভাবে বিকৃত হয়েছে যে তা পাঠ করা সত্ত্বেও তারা সেই জড় জগতের অন্ধকারেই আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার এই সমস্ত শিক্ষার্থীরা ভগবদ্গীতার জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়নি।

শ্রীমদ্ভাগবতে চারটি মুখ্য শ্লোকে যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ভগবদ্গীতাতেও প্রকৃতপক্ষে সেই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে। কিন্তু অসৎ ব্যক্তিদের মনগড়া এবং ভ্রান্ত বিশ্লেষণের ফলে মানুষ ভগবদ্গীতার চরম সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারে না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে (১৮/৬১) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে—

*ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জুন তিষ্ঠতি।*
*ভ্রাময়ন সর্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥*

ভগবান প্রতিটি জীবের হৃদয়ে (পরমাত্মারূপে) বিরাজমান এবং তিনি তাঁর বহিরঙ্গা শক্তির মাধ্যমে জড় জগতে সকলকে নিয়ন্ত্রণ করছেন।

তাই স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন পরম নিয়ন্তা এবং জীব সর্বদাই ভগবান কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সেই ভগবদ্গীতাতেই (১৮/৬৫) ভগবান নির্দেশ দিয়েছেন—

*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু ।*
*মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥*

ভগবদ্গীতার এই শ্লোকটিতে স্পষ্টভাবে ভগবানের নির্দেশ ব্যক্ত হয়েছে—সকলের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানকে স্মরণ করা, ভগবানের ভক্ত হওয়া, ভগবানের পূজা করা এবং ভগবানকে প্রণতি নিবেদন করা। তারফলে ভগবদ্ভক্ত নিঃসন্দেহে তাঁর প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাবে।

পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে যে সমগ্র মানব সমাজের বৈদিক কাঠামো এমনভাবে গঠিত হয়েছে যে প্রত্যেকেই ভগবানের পূর্ণ শরীরের বিভিন্ন অংশরূপে সক্রিয় হতে পারে। বুদ্ধিমান শ্রেণীর মানুষ বা ব্রাহ্মণেরা ভগবানের মস্তকে অবস্থিত ; শাসক শ্রেণীর মানুষ বা ক্ষত্রিয়েরা ভগবানের বাহুতে অবস্থিত ; উৎপাদক শ্রেণীর মানুষ বা বৈশ্যেরা ভগবানের কটিতে অবস্থিত ; এবং শ্রমিক শ্রেণীর মানুষ ও শূদ্রেরা ভগবানের পায়ে অবস্থিত। তাই সমগ্র সমাজ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের দেহ, এবং সেই দেহের বিভিন্ন অংশগুলি যথা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং শূদ্রের উদ্দেশ্য হচ্ছে যৌথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সমগ্র শরীরের সেবা করা ; তা না হলে অংশ পূর্ণ চেতনার সঙ্গে ঐক্য সাধনে অক্ষম হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। যৌথভাবে পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে বিশ্বচেতনা লাভ করা সম্ভব, এবং তার ফলেই কেবল সামগ্রিক পূর্ণতা লাভ করা যায়। তাই মহান বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, জ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, সমাজসেবী ইত্যাদি কেউই জড় জগতের অশান্ত সমাজে শান্তি আনতে পারে না, কেননা তারা ভাগবতের এই শ্লোকে বর্ণিত সফলতার রহস্য অর্থাৎ ভক্তিযোগের রহস্য সম্বন্ধে অবগত নয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও (৭/১৫) বলা হয়েছে ঃ

*ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ ।*
*মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥*

যেহেতু মানব সমাজের তথাকথিত মহান নেতারা ভক্তিযোগের এই মহান জ্ঞান সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, বহিরঙ্গা শক্তির দ্বারা মোহিত হয়ে সর্বদাই ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অপকর্মে লিপ্ত, তাই তারা পরমেশ্বর ভগবানের পরম ঈশ্বরত্বের অবজ্ঞা করে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করে এবং কখনই তাঁর শরণাগত হতে চায় না, কেননা তারা দুষ্কৃতকারী, মূঢ় এবং নরাধম।

এই প্রকার ভগবদ্বিদ্বেষী নাস্তিকেরা জড়জাগতিক বিচারে মহাপণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা হচ্ছে এই পৃথিবীর সবচাইতে বড় মূর্খ। ভগবানের বহিরঙ্গা মায়াশক্তির প্রভাবে তাদের তথাকথিত সমস্ত জ্ঞান অজ্ঞানে পর্যবসিত হয়েছে। তাই বর্তমান বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞানের সর্বপ্রকার প্রগতি পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রামরত কুকুর-বিড়ালের মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন মানুষদের দ্বারা অপচয় হচ্ছে। বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলা, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক উন্নতি, ধর্ম এবং মহান কার্যকলাপের সমস্ত জ্ঞান মৃতদেহ সাজানোর কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। মূর্খ জনগণের কাছ থেকে ভ্রান্ত প্রশংসা লাভ

করা ছাড়া একটি শবাধার সাজানোর আর কোন উপযোগিতা নেই। শ্রীমদ্ভাগবতে তাই বার বার বলা হয়েছে যে ভক্তিযোগের স্তর লাভ করা ব্যতীত মানব সমাজের সমস্ত কার্যকলাপ কেবল চরম ব্যর্থতা মাত্র। শ্রীমদ্ভাগবতে (৫/৫/৫) বলা হয়েছে—

*পরাভবস্তাবদবোধজাতো যাবন্ন জিজ্ঞাসত আত্মতত্ত্বম্।*
*যাবৎ ক্রিয়াস্তাবদিদং মনো বৈ কর্মাত্মকং যেন শরীরবন্ধঃ॥*

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ আত্ম-উপলব্ধির অনুসন্ধান সম্পর্কে অন্ধ থাকে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার সমস্ত জাগতিক কার্যকলাপ, তা যতই মহৎ হোক না কেন, বিভিন্ন প্রকার পরাজয় মাত্র। কেননা এইপ্রকার অর্থহীন এবং লাভহীন কার্যকলাপ সম্পাদনের মাধ্যমে মানব জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য কখনও চরিতার্থ হয় না। মানব শরীরের উদ্দেশ্য হচ্ছে জড় জগতের বন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া, কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ জড়জাগতিক কার্যকলাপে সম্পূর্ণ রূপে মগ্ন থাকে, ততক্ষণ তার মন জড় বিষয়ের আবর্তে মোহাচ্ছন্ন হয়ে থাকে এবং তার ফলে সে জন্ম-জন্মান্তরে জড় দেহের বন্ধনে আবদ্ধ থাকে।

*এবং মনঃ কর্মবশং প্রযুঙ্ক্তে অবিদ্যয়াত্মন্যুপধীয়মানে।*
*প্রীতির্ন যাবন্ময়ি বাসুদেবে ন মুচ্যতে দেহযোগেন তাবৎ॥*

*(ভাঃ ৫/৫/৬)*

বিভিন্ন প্রকার জড় ক্লেশ ভোগ করার জন্য মন বিভিন্ন প্রকার দেহ সৃষ্টি করে। তাই যতক্ষণ মন সকাম কর্মে লিপ্ত থাকে, ততক্ষণ মন অজ্ঞানের অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে এবং এইভাবে পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের প্রতি অপ্রাকৃত প্রেম লাভ না করা পর্যন্ত সে বার বার বিভিন্ন জড় শরীরের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবের অপ্রাকৃত নাম, গুণ, রূপ এবং লীলায় মগ্ন হওয়ার অর্থ হচ্ছে জড় বিষয়ের প্রতি মনের আসক্তিকে পরমতত্ত্ব জ্ঞানে রূপান্তরিত করা, যার ফলে মানুষ পরম তত্ত্ব উপলব্ধির পথে পরিচালিত হয় এবং বিভিন্ন প্রকার জড় দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে জড় জগতের বন্ধ মুক্ত হতে পারে।

শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভুপাদ তাই *সর্বত্র, সর্বদা* শব্দ দুটির টীকায় লিখেছেন যে ভক্তিযোগ বা ভগবানের প্রেমময়ী সেবা সর্বাবস্থায়ই অনুকূল ; অর্থাৎ সমস্ত শাস্ত্রেই ভক্তিযোগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সমস্ত মহাজনেরা তার অনুশীলন করেছেন, সমস্ত স্থানে তা গুরুত্বপূর্ণ, সমস্ত কার্য এবং কারণে তা উপযোগী ইত্যাদি। সমস্ত শাস্ত্রে ভক্তিযোগের অনুমোদন সম্বন্ধে তিনি স্কন্দপুরাণ থেকে ব্রহ্মানারদ সংবাদের উদ্ধৃতি দিয়েছেন

*সংসারেঽস্মিন্ মহাঘোরে জন্মমৃত্যুসমাকুলে।*
*পূজনং বাসুদেবস্য তারকং বাদিভিঃ স্থিতম॥*

জন্ম-মৃত্যু এবং বিভিন্ন প্রকার উৎকণ্ঠা সমন্বিত ভয়ঙ্কর অন্ধকারাচ্ছন্ন বিপদসঙ্কুল এই জড় জগতের মহাবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ভগবান শ্রীবাসুদেবের

অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হওয়া। এই সত্য সমস্ত শ্রেণীর দার্শনিকেরা স্বীকার করেছেন।

শ্রীল জীব গোস্বামী আরেকটি শ্লোকের উল্লেখ করেছেন যা পদ্মপুরাণ,স্কন্দপুরাণ এবং লিঙ্গপুরাণ এই তিনটি পুরাণে পাওয়া যায়। যথা—

*আলোড্য সর্বশাস্ত্রানি বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।*
*ইদমেকং সুনিষ্পন্নং ধ্যেয়োনারায়ণঃ সদা।।*

"পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত শাস্ত্র আলোচনা করে এবং পুনঃ পুনঃ তাদের বিচার করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে নারায়ণ হচ্ছেন পরম সত্য এবং সর্বদা তাঁরই ধ্যান করা উচিত এবং আরাধনা করা উচিত।" গরুড় পুরাণেও পরোক্ষভাবে সেই সত্যই বর্ণিত হয়েছেঃ

*পারং গতোহপি বেদানাং সর্বশাস্ত্রার্থবেদ্যপি।*
*যো ন সর্বেশ্বরে ভক্তস্তং বিদ্যাৎ পুরুষাধমম্ ।।*

"সমগ্র বেদে পারঙ্গত এবং সর্বশাস্ত্রবিদ্ হওয়া সত্ত্বেও যে ব্যক্তি সর্বেশ্বর বিষ্ণুর ভক্ত নয়, তাকে পুরুষাধম বলেই জানতে হবে।" তেমনই শ্রীমদ্ভাগবতেও (৫/১৮/১২) উল্লেখ করা হয়েছে—

*যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।*
*হরাবভক্তস্য কুতোমহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ।।*

যিনি পরমেশ্বর ভগবানের প্রতি অবিচলিত ভক্তিসম্পন্ন, তাঁর মধ্যে স্বর্গের দেবতাদের সমস্ত সদ্গুণগুলির সমাবেশ হয়। আর পক্ষান্তরে যারা ভগবানের ভক্ত নয়, তাদের মধ্যে কোনরকম মহৎ গুণ থাকতে পারে না, কেননা তারা সর্বদা মনোরথে আরোহণপূর্বক অজ্ঞানের অন্ধকারে বিচরণ করে এবং সবরকম অনিত্য জড় কার্যকলাপে সর্বদা যুক্ত থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতে (১১/১১/১৮) বলা হয়েছে—

*শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতো ন নিষ্ণায়াৎ পরে যদি।*
*শ্রমস্তস্য শ্রমফলো হ্যধেনুমিব রক্ষতঃ ।।*

"শব্দব্রহ্ম বেদে পারঙ্গত হয়েও যদি কেউ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণুতে রতিবিশিষ্ট না হয়, তার সমস্ত পরিশ্রম দুগ্ধ প্রদানে অক্ষম গাভী পালনের মতোই ব্যর্থ হয়।"

তেমনই ভগবানের সেবা করার অধিকার সকলেরই রয়েছে, এমনকি স্ত্রী, শূদ্র, হূণ, শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং অন্য সমস্ত পাপযোনি জীবদেরও রয়েছে।

*তে বৈ বিদন্ত্যতিতরন্তি চ দেবমায়াং*
*স্ত্রীশূদ্রহূণশবরা অপি পাপজীবাঃ।*
*যদ্যদ্ভুতক্রমপরায়ণশীলশিক্ষা-*
*স্তির্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ।।*

[ভাঃ ২/৭/৪৬]

ভগবানের অপ্রাকৃত প্রেমময়ী সেবায় পারঙ্গত সদ্‌গুরু কর্তৃক শিক্ষিত হলে সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষও ভগবদ্ভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হতে পারেন। সবচাইতে নিকৃষ্ট স্তরের মানুষের পক্ষে যদি তা সম্ভব হয়, তা হলে বৈদিক জ্ঞানে সুশিক্ষিত উৎকৃষ্ট মানুষদের সম্পর্কে আর বলার আছে? অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত রয়েছে, তা সে যেই হোক না কেন। এই ভক্তি সকল প্রকার মানুষদের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হতে পারে।

তাই সদ্‌গুরুর শিক্ষায় লব্ধ পূর্ণজ্ঞান সমন্বিত ভগবদ্ভক্তি সকলকেই অনুশীলন করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, এমনকি যারা মানুষ নয় তাদেরও জন্য। সেকথা প্রতিপন্ন করে গরুড় পুরাণে বলা হয়েছে—

*কীটপক্ষীমৃগানাঞ্চ হরৌ সন্ন্যস্তচেতসাম্।*
*ঊর্ধ্বামেব গতিং মন্যে কিং পুনর্জ্ঞানিনাং নৃণাম্॥*

"কীট, পক্ষী এবং পশুরাও পরমেশ্বর ভগবানের সেবায় সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হলে জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করতে পারে, অতএব মানুষদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তাদের কি কথা?"

তাই ভগবদ্ভক্তির অনুশীলনের জন্য উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন পাত্রের অন্বেষণ করার কোন প্রয়োজন নেই। তারা সদাচারযুক্ত হোক বা দুরাচারী হোক, তারা জ্ঞানী হোক অথবা মূর্খ হোক, তারা বিষয়ের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হোক অথবা বিরক্ত হোক, তারা মুক্ত হোক অথবা মুক্তিকামী হোক, তারা ভগবদ্ভক্তির সম্পাদনে পারদর্শী হোক অথবা অনভিজ্ঞ হোক, তারা সকলেই উপযুক্ত পরিচালকের পরিচালনায় ভগবদ্ভক্তি সম্পাদন করার মাধ্যমে পরমপদ প্রাপ্ত হতে পারে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/৩০-৩২) সেই সত্য প্রতিপন্ন হয়েছে—

*অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।*
*সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥*
*মাং হি পার্থ ব্যাপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।*
*স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥*

সর্বপ্রকার পাপকার্যে আসক্ত ব্যক্তিও যদি উপযুক্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধানে পরমেশ্বর ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, তা হলে তাঁকেও নিঃসন্দেহে একজন সাধু বলে বিবেচনা করতে হবে। এইভাবে যে কোন ব্যক্তি, এমনকি পতিতা স্ত্রী, স্বল্পবুদ্ধি শ্রমিক, স্বল্পবুদ্ধি বৈশ্য অথবা তাদের থেকেও নিকৃষ্ট স্তরের মানুষেরা জীবনের পরম পূর্ণতা লাভ করে তাদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন, যদি তাঁরা ঐকান্তিক নিষ্ঠা সহকারে পরমেশ্বর ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই ঐকান্তিক নিষ্ঠাই জীবনের পরম পূর্ণতা লাভের একমাত্র যোগ্যতা, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না এই প্রকৃত নিষ্ঠার উদয় হয় ততক্ষণ শুচি অথবা অশুচি, জ্ঞান অথবা অজ্ঞানের পার্থক্য থাকে।

আগুন সর্বাবস্থাতেই আগুন, এবং কেউ যদি তা স্পর্শ করে তা সে জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, তা হলে অগ্নি কোনরকম ভেদাভেদ বিচার না করে তার নিজের কাজ করবে। অর্থাৎ— *হরির্হরতি পাপানি দুষ্টচিত্তৈরপি স্মৃতঃ।*

সর্বশক্তিমান ভগবান তাঁর ভক্তকে পাপ কর্মের ফল থেকে মুক্ত করতে পারেন, যেমন সূর্য শক্তিশালী কিরণের মাধ্যমে সব কিছুকে দূষণমুক্ত করতে পারে। "জড় সুখ উপভোগের আকর্ষণ কখনই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তকে আকর্ষণ করতে পারে না।" শাস্ত্রে শত-সহস্র সূত্র রয়েছে। *আত্মারামশ্চ মুনয়ঃ* "আত্মতত্ত্ব উপলব্ধ মহাত্মারাও ভগবানের প্রেমময়ী সেবার প্রতি আকৃষ্ট হন।" *কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ*— "কেবল বাসুদেবের মহিমা শ্রবণ এবং কীর্তন করার মাধ্যমেই তাঁর মহান ভক্তে পরিণত হওয়া যায়।" *ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্লবনিমিষার্ধমপি স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ*—"যে ব্যক্তি এক পলকের জন্যওভগবানের শ্রীপাদপদ্ম থেকে বিচ্যুত হন না, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব।" *ভগবৎপার্ষদতাং প্রাপ্তে মৎসেবয়া প্রতীতং তে*— "ভগবানের শুদ্ধ ভক্তদের সুদৃঢ় বিশ্বাস রয়েছে যে তাঁরা তাঁর সঙ্গ লাভ করবেন, এবং তার ফলে তাঁরা সর্বদা ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় নিযুক্ত।" তাই সমস্ত মহাদেশে, সমস্ত লোকে, সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের প্রেমময়ী সেবা বা ভক্তিযোগ প্রচলিত রয়েছে, এবং সেটিই শ্রীমদ্ভাগবত ও অন্যান্য সমস্ত শাস্ত্রের বাণী। *সর্বত্র* শব্দটির অর্থ হচ্ছে ভগবানের সৃষ্টির প্রত্যেক অংশেই। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা অথবা কেবল মনের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়। দক্ষিণ ভারতীয় এক ব্রাহ্মণ কেবল তাঁর মনের দ্বারা ভগবানের সেবা করে ভগবানকে উপলব্ধি করেছিলেন।

যে ভক্ত যে কোন একটি ইন্দ্রিয়কে সর্বতোভাবে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেন, তাঁর সাফল্য অনিবার্য। যে কোন উপচারের দ্বারা ভগবানের সেবা করা যায়, এমনকি একটি ফুল, একটি পাতা, একটি ফল অথবা একটু জলের দ্বারাও ভগবানের সেবা করা যায়, যা ব্রহ্মাণ্ডের যে কোন স্থানে বিনামূল্যে আহরণ করা যায় এবং এইভাবে ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ব্রহ্মাণ্ডের জীবেরা ভগবানের সেবা করতে পারে। কেবল শ্রবণ করার মাধ্যমে তাঁর সেবা করা যায়, তাঁর লীলা কীর্তন করার মাধ্যমে অথবা পাঠ করার মাধ্যমে তাঁর সেবা করা যায়, অথবা তাঁকে স্বীকার করার মাধ্যমে এবং তাঁর আরাধনা করার মাধ্যমে তাঁকে সেবা করা যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে যে স্বীয় কর্মের ফল ভগবানকে নিবেদন করার মাধ্যমেও ভগবানের সেবা করা যায়, তা সে যাই করুক না কেন। সাধারণত মানুষ বলতে পারে যে সে যা করছে তা সে ভগবানের প্রেরণার জন্যই করছে, কিন্তু তাই সব কিছু নয়। মানুষের কর্তব্য হচ্ছে ভগবানের সেবকরূপে ভগবানের উদ্দেশ্যে কার্য করা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৯/২৭) ভগবান বলেছেন ঃ

*যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।*
*যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥*

তোমার যা করতে ভাল লাগে অথবা যা করা তোমার পক্ষে সহজসাধ্য তাই কর, তুমি যা খেতে চাও খাও, যে যজ্ঞ তোমার ইচ্ছা তা কর, তোমার যা দান করতে ইচ্ছা তা-ই দান কর এবং যে তপস্যা তোমার ইচ্ছা তা কর, কিন্তু সব কিছুই কেবল ভগবানেরই জন্য করতে হবে। তুমি যদি ব্যবসা কর অথরা চাকুরী কর তবে তা ভগবানের জন্য কর। তুমি যা খেতে চাও, তা ভগবানকে নিবেদন করতে পার এবং নিশ্চিন্ত থাকতে পারো যে তিনি তা ভোজন করার পর তোমাকে তা প্রসাদ রূপে ফিরিয়ে দেবেন। তিনি পরম পূর্ণ তাই ভক্ত তাঁকে যা অর্পণ করেন তা তিনি ভক্তের প্রেমের বশবর্তী হয়ে গ্রহণ করেন, কিন্তু পুনরায় তা তিনি তাঁর প্রসাদ রূপে ভক্তের কাছে ফিরিয়ে দেন। যাতে ভক্ত তা খেয়ে তৃপ্ত হতে পারেন। পক্ষান্তরে বলা যায়, ভগবানের সেবক হও এবং তার ফলে শান্তিপূর্ণভাবে জীবন যাপন কর, এবং চরমে তোমার প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাও। স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

*যস্য স্মৃত্যা চ নামোক্ত্যা তপোযজ্ঞক্রিয়াদিষু।*
*নূনং সম্পূর্ণতামেতি সদ্যো বন্দে তমচ্যুতম্ ॥*

"আমি অচ্যুত ভগবানকে আমার প্রণতি নিবেদন করি, কেননা কেবল তাঁকেই স্মরণ করার ফলে অথবা তাঁর দিব্য নাম উচ্চারণ করার ফলে সমস্ত তপস্যা, যজ্ঞ অথবা সকাম কর্মের সম্পূর্ণতা লাভ করা যায় এবং এই পন্থা সর্বত্র পালন করা যায়।" শ্রীমদ্ভাগবতে (২/৩/১০) আরও উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

*অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ।*
*তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥*

"কোন ব্যক্তি সর্বপ্রকার কামনাযুক্ত হতে পারেন অথবা সমস্ত কামনা থেকে মুক্ত হতে পারেন, কিন্তু তিনি পূর্ণ সিদ্ধি লাভের জন্য এই অচ্যুত ভক্তিযোগের পন্থা অনুসরণ করতে পারেন।" প্রত্যেক দেবদেবীকে প্রসন্ন করার জন্য ব্যস্ত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই, কেননা তাঁদের সকলেরই মূল হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান। গাছের গোড়ায় জল দিলে যেমন গাছের প্রতিটি ডালপালা এমনকি পাতার পুষ্টিসাধন হয়, তেমনি পরমেশ্বর ভগবানের সেবা করার ফলে কোনরকম পৃথক প্রচেষ্টা ব্যতীতই সমস্ত দেবদেবীর সেবা স্বাভাবিকভাবেই হয়ে যায়। ভগবান সর্বব্যাপ্ত, এবং তাই তাঁর সেবাও সর্বব্যাপ্ত। সেই তথ্য সমর্থন করে স্কন্দ পুরাণে বলা হয়েছে—

*অর্চিতে দেবদেবেশ শঙ্খচক্রগদাধরে।*
*অর্চিতাঃ সর্বদেবাঃ স্যুর্যতঃ সর্বগতো হরিঃ ॥*

যখন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী পরমেশ্বর ভগবানের আরাধনা হয়, তখন আপনা থেকেই অন্য সমস্ত দেবতাদের পূজাও সম্পন্ন হয়ে থাকে, কেননা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সর্বব্যাপ্ত। তাই সর্বক্ষেত্রেই, যথা কর্তা, কর্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, অধিকরণ এবং

সমর্থক, সকলেই ভগবানের প্রেমময়ী সেবার ফলে লাভবান হন। অর্থাৎ যিনি ভগবানের আরাধনা করেন, আরাধ্য ভগবান, আরাধনার উদ্দেশ্য, আরাধনার উপকরণের উৎস, আরাধনার স্থান ইত্যাদি সব কিছুই লাভান্বিত হয়।

এমনকি জড় জগতের প্রলয়ের সময়ও ভক্তিযোগের পন্থা প্রয়োগ করা যেতে পারে। *কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ম্*—প্রলয়ের সময় ভগবানের আরাধনা করা হয়, কেননা তিনি বেদসমূহকে রক্ষা করেন। প্রত্যেক যুগে তাঁর আরাধনা করা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে (১২/৩/৫২) বলা হয়েছে—

*কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।*
*দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥*

বিষ্ণুপুরাণে উল্লেখ করা হয়েছে—

*সহানিস্তন্ মহচ্ছিদ্রং স মোহঃ স চ বিভ্রমঃ।*
*যন্মুহূর্তং ক্ষণং বাপি বাসুদেবং ন চিন্তয়েৎ ॥*

"এক পলকের জন্যও যদি পরমেশ্বর ভগবান বাসুদেবকে স্মরণ না করা হয়, তা হলে সবচাইতে বড় ক্ষতি হয়, কেননা সেটিই হচ্ছে সবচাইতে বড় ভ্রম এবং সবচাইতে বড় বিড়ম্বনা।" জীবনের সমস্ত অবস্থায় ভগবানের আরাধনা করা যায়। যেমন, প্রহ্লাদ মহারাজ এবং পরীক্ষিৎ মহারাজ মাতৃজঠরে অবস্থানকালে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; শৈশবে, পাঁচবছর বয়সে ধ্রুব মহারাজ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; পূর্ণযৌবনে মহারাজ অম্বরীষ ভগবানের আরাধনা করেছিলেন ; এবং নৈরাশ্যের চরম অবস্থায় বার্ধক্যে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। অজামিল দেহত্যাগের সময় ভগবানের আরাধনা করেছিলেন এবং চিত্রকেতু স্বর্গে এবং নরকে ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। নৃসিংহপুরাণে বলা হয়েছে যে নারকিরা যখন ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন করতে শুরু করে, তখন তারা নরক থেকে স্বর্গ অভিমুখে উন্নীত হতে থাকে। দুর্বাসা মুনিও তার সমর্থনে বলেছেন—*মুচ্যেত যন্নাম্ন্যুদিতে নারকোঽপি*। "কেবলমাত্র ভগবানের দিব্যনাম কীর্তন করার ফলে নারকিরাও নরক-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি লাভ করে।" তাই শুকদেব গোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তস্বরূপ পরীক্ষিৎ মহারাজকে বলেছেন ঃ

*এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।*
*যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্তনম্ ॥*

"হে রাজন্! চরমে বিবেচনা করা হয়েছে যে সন্ন্যাসী, যোগী এবং সকাম কর্মী আদি সকলেরই বাঞ্ছিত ফল লাভের জন্য নির্ভয়ে ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা উচিত।" (ভাঃ ২/১/১১)।

তেমনই, শাস্ত্রের বিভিন্ন স্থানে পরোক্ষভাবে ইঙ্গিত করা হয়েছে—(১) সমস্ত বেদ

এবং সমস্ত শাস্ত্রে পারঙ্গত হওয়া সত্ত্বেও কেউ যদি পরমেশ্বর ভগবানের ভক্ত না হয়, তা হলে তাকে নরাধম বলে বিবেচনা করা হয়।

(২) গরুড় পুরাণ, বৃহন্নারদীয় পুরাণ, এবং পদ্ম পুরাণে এই উক্তিরই পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে—ভগবদ্ভক্তিবিহীন ব্যক্তির বৈদিক জ্ঞান এবং তপশ্চর্যার কি প্রয়োজন?

(৩) একজন ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে কি হাজার হাজার প্রজাপতিরও তুলনা করা যায়?

(৪) শুকদেব গোস্বামী বলেছেন (*ভাঃ ২/৪/১৭*) যে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়া ব্যতীত তপস্বী, দানশীল, যশস্বী, মনস্বী, মন্ত্রবিদ্ ও অন্য যে কোন সদাচারী ব্যক্তি তাদের বাঞ্ছিত ফল লাভ করতে পারে না।

(৫) স্বর্গে থেকেও মহিমান্বিত স্থানে যদি বৈকুণ্ঠনাথ পরমেশ্বর ভগবান অথবা তাঁর শুদ্ধ ভক্তের মহিমা কীর্তন না হয়, তা হলে সেই স্থান তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য।

(৬) ভগবানের শুদ্ধভক্ত ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার জন্য পাঁচ প্রকার মুক্তি গ্রহণ করেন না।

তাই চরম সিদ্ধান্ত হচ্ছে যে সর্বদা এবং সর্বত্র ভগবানের মহিমা কীর্তন করা অবশ্য কর্তব্য। ভগবানের মহিমা শ্রবণ করা উচিত, কীর্তন করা উচিত এবং স্মরণ করা উচিত, কেননা সেটিই হচ্ছে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। সকাম কর্ম কেবল ভোগ্য শরীর পর্যন্ত সীমিত; যোগ কেবল সিদ্ধি পর্যন্ত সীমিত; শুষ্ক দর্শন কেবল দিব্য জ্ঞানের উপলব্ধি পর্যন্ত সীমিত; এবং দিব্যজ্ঞান মুক্তিলাভ পর্যন্ত সীমিত। যদি এই সমস্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় তবুও সেই মার্গে ত্রুটির সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু দিব্য-ভগবদ্ভক্তিতে কোন সীমা নেই এবং অধঃপতনেরও ভয় নেই। সেই পন্থা ভগবানের কৃপায় আপনা থেকেই চরম স্তরে পৌঁছে দেয়। ভগবদ্ভক্তির প্রাথমিক স্তরে আপাত দৃষ্টিতে জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে, কিন্তু উন্নত স্তরে এই প্রকার জ্ঞানের কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। তাই ভক্তিযোগ বা শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির পন্থাই হচ্ছে পারমার্থিক উন্নতি সাধনের সর্বোত্তম তথা নিশ্চিত পন্থা।

কখনও কখনও নির্বিশেষবাদীরা শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি শ্লোক নিষ্পেষণ করে বা নিঙড়ে তাদের মতবাদের অনুকূল ব্যাখ্যা করে, কিন্তু সাবধানতার সঙ্গে বিবেচনা করা উচিৎ যে এই চারটি শ্লোক ভগবান স্বয়ং বর্ণনা করেছেন, এবং তাই ভগবান সম্বন্ধে কোনরকম জ্ঞানবিহীন যে নির্বিশেষবাদী, তাদের এখানে প্রবেশ করার কোনই সম্ভাবনা নেই। তাই নির্বিশেষবাদীরা সেগুলি নিঙড়ে যে অর্থই বার করুক না কেন, তাদের সেই ব্যাখ্যা কখনই ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পরম্পরায় দীক্ষিত ব্যক্তির দ্বারা স্বীকৃত হবে না। আর তা ছাড়া শ্রুতিতে প্রতিপন্ন করা হয়েছে যে, পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবান কখনও নিজেকে জ্ঞানমদে মত্ত ব্যক্তির কাছে প্রকাশ করেন না। শ্রুতিমন্ত্রে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে (*কঠোপনিষদ ১/২/২৩*)

*নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।*
*যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্।*

ভগবান স্বয়ং সব কিছু বিশ্লেষণ করেছেন, এবং যারা ভগবানের সবিশেষ রূপ পর্যন্ত পৌছাতে পারেনি, তারা গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তি-ভাগবত কর্তৃক শিক্ষিত না হয়ে শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে না।

## শ্লোক ৩৭

**এতন্মতং সমাতিষ্ঠ পরমেণ সমাধিনা।**
**ভবান্ কল্পবিকল্পেষু ন বিমুহ্যতি কর্হিচিৎ ॥ ৩৭ ॥**

**এতৎ**—এই ; **মতম্**—সিদ্ধান্ত ; **সমাতিষ্ঠ**—স্থির থাকে ; **পরমেণ**—পরম কর্তৃক ; **সমাধিনা**—সমাধির দ্বারা ; **ভবান্**—তুমি ; **কল্প**—অন্তর্বর্তী প্রলয়ে ; **বিকল্পেষু**—অন্তিম প্রলয়ে ; **ন বিমুহ্যতি**—বিমোহিত হবে না ; **কর্হিচিৎ**—কোন কিছু।

## অনুবাদ

**হে ব্রহ্মা! তুমি একাগ্র চিত্তে আমার এই সিদ্ধান্তের অনুসরণ কর, তা হলে কল্পে ও বিকল্পে কোনরকম অহঙ্কার তোমাকে বিচলিত করবে না।**

## তাৎপর্য

ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে পরমেশ্বর ভগবান সমস্ত গীতার সারাংশ চারটি শ্লোকে, যথা—*অহং সর্বস্য প্রভবঃ* ইত্যাদিতে প্রদান করেছেন। তেমনই সমগ্র শ্রীমদ্ভাগবতের সারাংশ চারটি শ্লোকে যথা—*অহমেবাসমেবাগ্রে* ইত্যাদিতে প্রদান করেছেন। এইভাবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ভাগবত-সিদ্ধান্তের গুহ্যতম উদ্দেশ্য শ্রীমদ্ভাগবতের আদি বক্তা যিনি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতারও আদি বক্তা, সেই পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিশ্লেষিত হয়েছে। বহু বৈয়াকরণিক অভক্ত এবং তার্কিক শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি শ্লোকের কদর্থ করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান স্বয়ং ব্রহ্মাকে উপদেশ দিয়েছেন তিনি যে স্থির সিদ্ধান্ত তাঁকে শিক্ষা দিয়েছেন তা থেকে বিচলিত না হতে।

শ্রীমদ্ভাগবতের সারমর্ম চারটি শ্লোকে ভগবান শিক্ষা দিয়েছেন এবং ব্রহ্মা সেই জ্ঞান লাভ করেছিলেন। নির্বিশেষবাদীদের শব্দ বিন্যাসের দ্বারা *অহম্* শব্দের ভ্রান্ত বিশ্লেষণ যেন কখনও শ্রীমদ্ভাগবতের নিষ্ঠাবান অনুগামীর মনকে বিচলিত না করে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীভগবানের বিষয়ে পাঠ, এবং এটি তাঁর অনন্য ভক্তদের, যাঁদের ভাগবত বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে, তাঁদের পাঠ্য ; ভগবদ্ভক্তির এই গুহ্যতম শাস্ত্রে অন্য কারো প্রবেশের অধিকার নেই।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পরমেশ্বর ভগবানের সঙ্গে যাদের কোন সম্পর্ক নেই, সেই নির্বিশেষবাদীরা কখনো কখনো ব্যাকরণ এবং শুষ্ক অনুমানের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করে। তাই ভগবান ব্রহ্মাকে (এবং ব্রহ্মার মাধ্যমে ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের

সমস্ত ভবিষ্যৎ* ভক্তদের) সতর্ক করে দিয়েছেন যে তারা যেন কখনো অল্পজ্ঞ বৈয়াকরণিক এবং তার্কিকদের সিদ্ধান্তের দ্বারা বিচলিত না হয় এবং গুরুপরম্পরার মাধ্যমে মনকে যথাযথভাবে সর্বদা একাত্ম করে রাখে। জড় জ্ঞানের মাধ্যমে শ্রীমদ্ভাগবতের নতুন ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা উচিত নয় এবং তাই এই জ্ঞান আহরণ করার প্রথম পন্থা হচ্ছে পরম্পরার ধারায় ভগবানের প্রতিনিধি সদ্‌গুরুর শরণাগত হওয়া। কখনো অপূর্ণ জড় জ্ঞানের মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ বার করা উচিত নয়। সদ্‌গুরু প্রামাণিক বৈদিক শাস্ত্রের ভিত্তিতে শিষ্যকে যথার্থ পন্থায় শিক্ষা দান করতে সক্ষম। তিনি কখনো শিষ্যকে বিভ্রান্ত করার জন্য বাক্য বিন্যাস করার চেষ্টা করেন না। সদ্‌গুরু তাঁর স্বীয় আচরণের মাধ্যমে শিষ্যকে ভগবদ্ভক্তির তত্ত্ব শিক্ষা দেন। ভগবদ্ভক্তি বা ভগবানের সেবা ব্যতীত, মনোধর্মপ্রসূত জল্পনা-কল্পনার মাধ্যমে জন্ম-জন্মান্তর ধরে প্রচেষ্টা করলেও চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। সৎ শাস্ত্র কর্তৃক সমর্থিত সদ্‌গুরুর নির্দেশ অনুসরণ করে চললে শিষ্য পূর্ণজ্ঞানের স্তরে উন্নীত হবে, যা প্রদর্শিত হবে জড়বিষয় ভোগের প্রতি বিরক্তির মাধ্যমে। জড়বাদীরা ভগবদ্ভক্তের বৈরাগ্য দর্শন করে বিস্মিত হয় এবং তাই তাদের কাছে ভগবদুপলব্ধির প্রয়াস রহস্যময় বলে মনে হয়। ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের প্রতি বিরক্তিকে বলা হয় *ব্রহ্মভূত* অবস্থা। এটি হচ্ছে ভগবদ্ভক্তির (পরাভক্তির) প্রাথমিক স্তর। *ব্রহ্মভূত-স্তরের* আরেকটি নাম হচ্ছে *আত্মারাম-স্তর,* যে স্তরে মানুষ সম্পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্তি অনুভব করে এবং ইন্দ্রিয় সুখভোগের কোনরকম আকাঙ্ক্ষা তখন আর থাকে না। এই সম্পূর্ণ প্রসন্নতার স্তর পরমেশ্বর ভগবানকে উপলব্ধি করার আদর্শ অবস্থা। শ্রীমদ্ভাগবতে (১/২/২০) প্রতিপন্ন হয়েছে ঃ

*এবং প্রসন্নমনসো ভগবদ্ভক্তিযোগতঃ।*
*ভগবত্তত্ত্ববিজ্ঞানং মুক্তসঙ্গস্য জায়তে ॥*

এই আত্মারাম স্থিতি, যা ভক্তির অনুশীলনের ফলস্বরূপ জড় ইন্দ্রিয় উপভোগের প্রতি পূর্ণ বিরক্তির দ্বারা প্রকট হয়, সেই স্তরে মানুষ ভগবত্তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে।

এই পূর্ণ প্রসন্নতা এবং ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের প্রতি বিরক্তির স্তরে মানুষ গূঢ় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞানের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে পারে, এবং এই জ্ঞান জাগতিক বিদ্যা বা জল্পনা-কল্পনার উপর নির্ভর করে না। ব্রহ্মা যেহেতু সেই জ্ঞান লাভের যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তাই ভগবান তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে তাঁর কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন। ভগবান কর্তৃক প্রদত্ত এই উপদেশ জড় বিষয়ের প্রতি বিরক্ত যে কোন ভক্তের জন্যই সুলভ, যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/১০) উল্লেখ করা হয়েছে।

*তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।*
*দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥*

যে সমস্ত ভক্তরা নিরন্তর প্রীতিপূর্বক ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত, ভগবান তাঁদের প্রতি তাঁর অহৈতুকী কৃপার বশবর্তী হয়ে তাঁদের প্রত্যক্ষভাবে পরিচালনা করেন, যাতে তাঁরা পারমার্থিক মার্গে যথাযথভাবে অগ্রসর হয়ে তাঁদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে পারেন। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের এই চারটি শ্লোকের মর্ম জল্পনা-কল্পনা করার মাধ্যমে উপলব্ধি করার চেষ্টা করা উচিত নয়। পক্ষান্তরে প্রত্যক্ষভাবে পরমেশ্বর ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার মাধ্যমে তাঁর ধাম বৈকুণ্ঠলোক সম্বন্ধে পূর্ণরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়, ঠিক যেমন ব্রহ্মাজী করেছিলেন। এই বৈকুণ্ঠ উপলব্ধি ভগবানের সেবা করার মাধ্যমে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত যে কোন ভগবদ্ভক্তের পক্ষেই সম্ভব।

গোপাল-তাপনী উপনিষদে (শ্রুতি) বর্ণনা করা হয়েছে, *গোপবেশো মে পুরুষঃ পুরস্তাদ্ আবির্বভূব*—ভগবান ব্রহ্মার সম্মুখে এক গোপবালকরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন, অর্থাৎ আদিপুরুষ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা গোবিন্দরূপে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন, যার বর্ণনা ব্রহ্মাজী ব্রহ্ম সংহিতায় (৫/২৯) বর্ণনা করেছেন ঃ

*চিন্তামণিপ্রকরসদ্মসু কল্পবৃক্ষ-*
*লক্ষাবৃতেষু সুরভীরভিপালয়ন্তম্ ।*
*লক্ষ্মীসহস্রশতসম্ভ্রমসেব্যমানং*
*গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥*

ব্রহ্মাজী গোলোক বৃন্দাবন নামক বৈকুণ্ঠের সর্বোচ্চ লোকে বিরাজমান পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আরাধনা করতে চেয়েছিলেন। সেই গোলোক বৃন্দাবনে তিনি সুরভী গাভীদের পালন করেন, এবং সেখানেই তিনি শত সহস্র লক্ষ্মীগণ (গোপীগণ) কর্তৃক প্রীতি ও সম্ভ্রম সহকারে সেবিত হন।

তাই শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন আদি পরমেশ্বর ভগবান (*কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং*)। সেকথাও এই বর্ণনার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে। পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ ; নারায়ণ অথবা পুরুষাবতার নন, যাঁরা হচ্ছেন তাঁর অংশ এবং কলা। তাই শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থ হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ভাবনায় ভাবিত হওয়া। শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে শব্দরূপে ভগবানের প্রকাশ, এবং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও ঠিক তাই। এইভাবে স্থির নিশ্চিতভাবে জানা যায় যে শ্রীমদ্ভাগবত হচ্ছে ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান, যাঁর মাধ্যমে ভগবান এবং তাঁর ধাম পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায়।

## শ্লোক ৩৮

### শ্রীশুক উবাচ

**সম্প্রদিশ্যৈবমজনো জনানাং পরমেষ্ঠিনম্ ।**
**পশ্যতস্তস্য তদ্রূপমাত্মনো ন্যরুণদ্ধরিঃ ॥ ৩৮ ॥**

**শ্রীশুকঃ উবাচ**—শ্রীশুকদেব গোস্বামী বললেন; **সম্প্রদিশ্য**—ব্রহ্মাজীকে পূর্ণরূপে উপদেশ দিয়ে; **এবম্**—এইভাবে; **অজনো**—পরমেশ্বর ভগবান; **জনানাং**—জীবদের; **পরমেষ্ঠিনম্**—প্রধান নায়ক ব্রহ্মাকে; **পশ্যতঃ**—দর্শন করার সময়; **তস্য**—তাঁর; **তৎ-রূপম্**—সেই অপ্রাকৃত রূপ; **আত্মনঃ**—নিজের; **ন্যরুণৎ**—অন্তর্হিত হয়েছিলেন; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

## অনুবাদ

**শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতকে বললেন—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি লোকসমূহের পরম আধিপত্যে স্থিত ব্রহ্মাকে এইভাবে উপদেশ প্রদান করে তাঁর সামনে থেকে তাঁর সেই অপ্রাকৃত রূপ অন্তর্হিত করলেন।**

## তাৎপর্য

এই শ্লোকে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে ভগবান হচ্ছেন *অজনঃ* অর্থাৎ পরম পুরুষ, এবং তিনি তাঁর অপ্রাকৃত রূপ (*আত্মনো রূপম্*) শ্রীমদ্ভাগবতের সারস্বরূপ চতুঃশ্লোক উপদেশ দেওয়ার সময় ব্রহ্মাজীকে প্রদর্শন করেছিলেন। তিনি সমস্ত জীবেদের মধ্যে (*জনানাম্*) পরমপুরুষ (*অজনঃ*)। সমস্ত জীবেরা স্বতন্ত্র ব্যক্তিবিশেষ, এবং তাদের মধ্যে পরমেশ্বর ভগবান হচ্ছেন পরম পুরুষ, যে সম্বন্ধে শ্রুতি মন্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে *নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্*। তাই চিজ্জগতে জড় জগতের মতো নির্বিশেষ রূপের কোন অবকাশ নেই। যেখানেই চেতনা বা জ্ঞান রয়েছে, সেখানে সবিশেষ রূপ থাকতে বাধ্য। চিজ্জগতে সব কিছুই পূর্ণ জ্ঞানময়, এবং তাই সেখানকার ভূমি, জল, বৃক্ষ, পর্বত, নদী, মানুষ, পশু-পক্ষী সব কিছুই এক গুণসম্পন্ন, অর্থাৎ চিন্ময়, এবং তাই সেখানে সব কিছুই সবিশেষ এবং স্বতন্ত্র সত্তাসমন্বিত। সর্বশ্রেষ্ঠ বৈদিক শাস্ত্র শ্রীমদ্ভাগবত আমাদের সেই তথ্য প্রদান করে, এবং এই শ্রীমদ্ভাগবত পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাজীকে প্রদান করেছিলেন, যাতে সমস্ত জীবের পরম নেতারূপে ব্রহ্মা সারা ব্রহ্মাণ্ড জুড়ে ভক্তিযোগের পরম তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার জন্য তা প্রচার করতে পারেন। ব্রহ্মাজী তাঁর প্রিয় পুত্র নারদকে শ্রীমদ্ভাগবতের এই জ্ঞান উপদেশ দিয়েছিলেন এবং নারদ তা ব্যাসদেবকে দান করেছিলেন, ব্যাসদেব তা শুকদেব গোস্বামীকে উপদেশ দিয়েছিলেন। শুকদেব গোস্বামীর মহানুভবতার ফলে এবং পরীক্ষিৎ মহারাজের কৃপায় আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব সমন্বিত এই শ্রীমদ্ভাগবতম্ প্রাপ্ত হয়েছি।

## শ্লোক ৩৯

**অন্তর্হিতেন্দ্রিয়ার্থায় হরয়ে বিহিতাঞ্জলিঃ।**
**সর্বভূতময়ো বিশ্বং সসর্জেদং স পূর্ববৎ ॥ ৩৯ ॥**

**অন্তর্হিতে**—অন্তর্ধানের পর ; **ইন্দ্রিয়ার্থায়**—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের লক্ষ্য পরমেশ্বর ভগবানকে ; **হরয়ে**—ভগবানকে ; **বিহিতাঞ্জলি**—অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে ; **সর্বভূত**—সমস্ত জীব ; **ময়ঃ**—পূর্ণ ; **বিশ্বম্**—ব্রহ্মাণ্ড ; **সসর্জ**—সৃষ্টি করেছিলেন ; **ইদম্**—এই ; **স**— তিনি (ব্রহ্মাজী) ; **পূর্ববৎ**—ঠিক পূর্বের মতো।

## অনুবাদ

**ভক্তদের দিব্য আনন্দ প্রদানকারী পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি অন্তর্হিত হলে সর্বভূতময় সেই ব্রহ্মা তাঁর উদ্দেশ্যে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে পূর্বপূর্ব কল্পের মতো এই বিশ্ব সৃষ্টি করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি সমস্ত জীবের ইন্দ্রিয়ের পূর্ণতা প্রদানকারী। ভগবানের বহিরঙ্গা প্রকৃতির উজ্জ্বল প্রতিবিম্বে মোহিত হয়ে জীবেরা পরমেশ্বর ভগবানের ইচ্ছা অনুসারে তাঁর সেবায় যুক্ত হওয়ার পরিবর্তে তাদের ইন্দ্রিয়ের উপাসনা করে।

*হরিভক্তিসুধোদয়ে* (১৩/২) নিম্নলিখিত শ্লোকটির উল্লেখ করা হয়েছে—

*অক্ষ্ণোঃ ফলং ত্বাদৃশ-দর্শনং হি*
*তনোঃ ফলং ত্বাদৃশগাত্রসঙ্গঃ।*
*জিহ্বাফলং ত্বাদৃশকীর্তনং হি*
*সুদুর্লভা ভাগবতা হি লোকে ॥*

"হে ভগবদ্ভক্ত! কেবল আপনাকে দর্শন করার ফলে চক্ষু সার্থক হয়। আপনার দেহ স্পর্শ করার ফলে স্পর্শেন্দ্রিয় সার্থক হয়। আপনার মহিমা কীর্তন করার ফল জিহ্বা সার্থক হয়, কেননা এই জগতে ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত অত্যন্ত দুর্লভ।"

প্রকৃতপক্ষে ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তের সেবা করার জন্য জীবদেহের ইন্দ্রিয়সমূহ প্রদান করা হয়েছে, কিন্তু বদ্ধ জীবেরা জড়া প্রকৃতি কর্তৃক মোহিত হয়ে ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে। তাই সমগ্র ভগবদ্ভক্তির পন্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে ইন্দ্রিয়ের বিকৃত কার্যকলাপ সংশোধন করে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় তাদের যুক্ত করা। ব্রহ্মা জীব সৃষ্টি করে ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবানের সেবায় যুক্ত করেছিলেন। এইভাবে এই জড় জগতের সৃষ্টি এবং সংহার সাধিত হয় ভগবানের ইচ্ছার মাধ্যমে। বদ্ধ জীবদের প্রকৃত আলয় ভগবদ্ধামে ফিরে যাওয়ার সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে এই জগতের সৃষ্টি হয়, এবং ব্রহ্মাজী, নারদজী, ব্যাসজী প্রমুখ সেবকেরা ভগবানের সেই উদ্দেশ্য সাধনের কার্যে লিপ্ত হন। তাঁরা বদ্ধ জীবদের ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির ক্ষেত্র থেকে উদ্ধার করে ভগবানের সেবায় যুক্ত হওয়ার মাধ্যমে তাদের প্রকৃত স্বরূপে ফিরিয়ে নিয়ে যান।

নির্বিশেষবাদীরা তা না করে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বিকৃত কার্যকলাপের সংশোধন না করার পরিবর্তে বদ্ধ জীবদের ইন্দ্রিয়-বিহীন করার চেষ্টা করে এবং প্রচার করে যে

ভগবানও ইন্দ্রিয়বিহীন। বদ্ধ জীবদেহের রোগ নিরাময়ের এটি এক প্রকার ভ্রান্ত চিকিৎসা। ইন্দ্রিয়ের রোগগ্রস্ত অবস্থার নিরাময় করার মাধ্যমে তার চিকিৎসা করা উচিত, ইন্দ্রিয়সমূহকে সমূলে উৎপাটিত করার মাধ্যমে নয়। যখন চোখের কোন রোগ হয়, তখন সেই রোগের চিকিৎসা করা হয় যাতে চোখ আবার যথাযথভাবে দর্শন করতে পারে। চক্ষু উপড়ে ফেলা কোন চিকিৎসা নয়। তেমনই, ভবরোগের ভিত্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়-তৃপ্তি, এবং সেই রোগমুক্তির উপায় হচ্ছে ইন্দ্রিয়গুলিকে পুনরায় ভগবানের সেবায় যুক্ত করার মাধ্যমে ভগবানের অপ্রাকৃত রূপ দর্শন করা, তাঁর মহিমা কীর্তন করা এবং সর্বতোভাবে তাঁর প্রীতি সম্পাদনের জন্য কর্ম করা। এইভাবে ব্রহ্মাজী পুনরায় ব্রহ্মাণ্ডের কার্যকলাপের সূচনা করেছিলেন।

## শ্লোক ৪০

**প্রজাপতির্ধর্মপতিরেকদা নিয়মান্ যমান্।**
**ভদ্রং প্রজানামম্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠৎ স্বার্থকাম্যয়া ॥ ৪০ ॥**

**প্রজাপতিঃ**—সমস্ত জীবের পূর্বপুরুষ ; **ধর্মপতিঃ**—ধর্মের পিতা ; **একদা**—কোন এক সময়ে ; **নিয়মান্**—বিধিবিধান ; **যমান্**—সংযমের নিয়ম ; **ভদ্রম্**—কল্যাণ ; **প্রজানাম্**—জীবেদের ; **অম্বিচ্ছন্**—কামনা করে ; **আতিষ্ঠৎ**—স্থিত ; **স্ব-অর্থ**—নিজের প্রয়োজনে ; **কাম্যয়া**—কামনা করে।

### অনুবাদ

**একদা প্রজাপতি এবং ধর্মপতি ব্রহ্মা সমস্ত জীবের মঙ্গল কামনা করে এবং নিজের প্রয়োজন সাধনের জন্য বিধিপূর্বক যম-নিয়মসমূহ অনুষ্ঠান করেছিলেন।**

### তাৎপর্য

বিধি-নিষেধের অনুষ্ঠান না করে কেউ কখনো উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হতে পারে না। ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অসংযত জীবন পশুজীবন এবং ব্রহ্মা তাঁর বংশধরদের উন্নততর কর্তব্য সম্পাদন করার জন্য ইন্দ্রিয়-সংযমের এই শিক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি ভগবানের দাসরূপে সকলের কল্যাণ কামনা করেছিলেন। কেউ যদি তাঁর পরিবারের সদস্যদের এবং বংশধরদের কল্যাণ কামনা করেন, তা হলে তাঁকে অবশ্যই নৈতিক এবং ধার্মিক জীবন যাপন করতে হয়। সর্বোত্তম নৈতিক জীবন হচ্ছে ভগবানের ভক্ত হওয়া, কেননা ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত ভগবানের সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত। পক্ষান্তরে যিনি ভগবানের ভক্ত নন, তিনি জড় জগতের বিচারে যতই গুণসম্পন্ন হন না কেন, তাঁর মধ্যে কোন সদ্‌গুণ থাকতে পারে না। ব্রহ্মা এবং গুরু-পরম্পরার ধারায় সমস্ত শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তেরা স্বয়ং আচরণ না করে তাঁদের অধস্তনদের কোনরকম নির্দেশ দেন না।

## শ্লোক ৪১

**তং নারদঃ প্রিয়তমো রিক্‌থাদানামনুব্রতঃ ।**
**শুশ্রূষমাণঃ শীলেন প্রশ্রয়েণ দমেন চ ॥ ৪১ ॥**

**তম্**—তাঁকে ; **নারদঃ**—মহামুনি নারদ ; **প্রিয়তমঃ**—অত্যন্ত প্রিয় ; **রিক্থ-আদানাম্**—উত্তরাধিকারী পুত্রদের ; **অনুব্রতঃ** —অত্যন্ত বাধ্য ; **শুশ্রূষমাণঃ**—সর্বদা সেবা করতে প্রস্তুত ; **শীলেন**—সৎ আচরণ দ্বারা ; **প্রশ্রয়েণ**—বিনয়ের দ্বারা ; **দমেন**—ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা ; **চ**—ও ।

### অনুবাদ

**ব্রহ্মার উত্তরাধিকারী পুত্রদের মধ্যে সবচাইতে প্রিয়তম নারদ, যিনি সর্বদা তাঁর সেবায় তৎপর, এবং তাঁর পিতার উপদেশসমূহ সুশীল আচরণ, বিনয় এবং ইন্দ্রিয় সংযমের দ্বারা পালন করতেন ।**

## শ্লোক ৪২

**মায়াং বিবিদিষন্ বিষ্ণোর্মায়েশস্য মহামুনিঃ ।**
**মহাভাগবতো রাজন্ পিতরং পর্যতোষয়ৎ ॥ ৪২ ॥**

**মায়াম্**—শক্তি সমূহ ; **বিবিদিষন্**—জানতে ইচ্ছা করে ; **বিষ্ণোঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের ; **মায়া-ঈশস্য**—সমস্ত শক্তির অধীশ্বরের ; **মহামুনিঃ**—মহর্ষি ; **মহাভাগবতঃ**—ভগবানের উৎকৃষ্ট ভক্ত ; **রাজন্**—হে রাজন ; **পিতরম্**—তাঁর পিতাকে ; **পর্যতোষয়ৎ**—অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন ।

### অনুবাদ

**হে রাজন্ ! মহর্ষি এবং ভক্ত শ্রেষ্ঠ নারদ তাঁর পিতাকে অত্যন্ত প্রসন্ন করেছিলেন এবং মায়েশ্বর বিষ্ণুর সমস্ত শক্তি সম্বন্ধে জানতে ইচ্ছা করেছিলেন ।**

### তাৎপর্য

ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত জীবের সৃষ্টিকর্তা হওয়ার ফলে ব্রহ্মা দক্ষ, চতুঃসন এবং নারদ প্রমুখ বহু বিখ্যাত পুত্রের পিতা। বৈদিক জ্ঞানের তিনটি বিভাগ কর্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং উপাসনা কাণ্ডের মধ্যে নারদমুনি তাঁর পিতা ব্রহ্মার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে উপাসনা বা ভগবদ্ভক্তির পন্থা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, আর দক্ষ কর্মকাণ্ড এবং সনক, সনাতন আদি চতুঃসনেরা তাঁদের পিতার কাছ থেকে জ্ঞানকাণ্ড প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে নারদকে তাঁর সদাচার, আজ্ঞাপালন, বিনয় এবং পিতার প্রতি সেবার তৎপরতার জন্য তাঁকে ব্রহ্মার সবচাইতে প্রিয়তম পুত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে। নারদ সমস্ত

ঋষিদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে বিখ্যাত, কেননা তিনি হচ্ছেন সমস্ত ভক্তদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভক্ত। নারদ ভগবানের বহু প্রসিদ্ধ ভক্তের গুরু। তিনি প্রহ্লাদ, ধ্রুব, ব্যাস থেকে শুরু করে বন্য শিকারী কিরাত পর্যন্ত বহু ভক্তের গুরু। তাঁর একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে সকলকে ভগবানের প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত করা। নারদমুনির এই সমস্ত গুণাবলীর জন্য তিনি তাঁর পিতার প্রিয়তম পুত্র, এবং সেই কারণে নারদমুনি হচ্ছেন ভগবানের অতি উৎকৃষ্ট ভক্ত। ভগবদ্ভক্ত সর্বদাই সমস্ত শক্তির অধীশ্বর পরমেশ্বর ভগবান সম্বন্ধে জানতে উৎসুক। যে সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (১০/৯) প্রতিপন্ন হয়েছে—

*মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।*
*কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥*

পরমেশ্বর ভগবান অনন্ত, এবং তাঁর শক্তিসমূহও অনন্ত। কেউই পূর্ণরূপে তাঁকে জানতে পারে না। এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবরূপে এবং সরাসরিভাবে ভগবান কর্তৃক উপদিষ্ট হওয়ার ফলে ব্রহ্মাজী অবশ্যই এই ব্রহ্মাণ্ডের অন্য সকলের থেকে ভগবান সম্বন্ধে অধিক অবগত, যদিও এই জ্ঞান কখনই পূর্ণ হতে পারে না। তাই সকলের কর্তব্য হচ্ছে ব্রহ্মার শিষ্যপরম্পরায়, যা নারদ থেকে ব্যাস, ব্যাসদেব থেকে শুকদেব গোস্বামী আদি ভক্তের ধারায় প্রবাহিত হয়েছে, সেই পরম্পরার অন্তর্ভুক্ত সদ্গুরুর কাছে সেই অনন্ত ভগবান সম্বন্ধে জানবার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করা।

## শ্লোক ৪৩

**তুষ্টং নিশাম্য পিতরং লোকানাং প্রপিতামহম্।**
**দেবর্ষিঃ পরিপপ্রচ্ছ ভবান্ যন্মানুপৃচ্ছতি ॥ ৪৩ ॥**

**তুষ্টম্**—সন্তুষ্ট হয়ে; **নিশাম্য**—দর্শন করে; **পিতরম্**—পিতাকে; **লোকানাম্**— সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের; **প্রপিতামহম্**—প্রপিতামহ; **দেবর্ষিঃ**—দেবর্ষি নারদ; **পরিপপ্রচ্ছ**— প্রশ্ন করেছিলেন; **ভবান্**—আপনি; **যৎ**—যেমন; **মা**—আমার কাছে; **অনুপৃচ্ছতি**— প্রশ্ন করছেন।

## অনুবাদ

**হে মহারাজ, আপনি এখন আমাকে যে সমস্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছেন, দেবর্ষি নারদ লোকসমূহের প্রপিতামহ স্বীয় পিতা ব্রহ্মাকে প্রসন্ন দেখতে পেয়ে সেই সমস্ত প্রশ্নই করেছিলেন।**

## তাৎপর্য

চিন্ময় বা দিব্যজ্ঞান লাভ করার জন্য তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষের কাছে প্রশ্ন করার যে বিধি, তা পাঠশালার শিক্ষকের কাছে সাধারণ প্রশ্ন করার মতো নয়। আধুনিক যুগে বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা কতকগুলি তথ্য প্রদান করার জন্য বেতনভোগী কর্মচারী মাত্র,

কিন্তু গুরুদেব বেতনভোগী কর্মচারী নন। তিনি যথার্থ অধিকার প্রাপ্ত না হয়ে উপদেশ দান করতে পারেন না। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় (৪/৩৪) দিব্যজ্ঞান লাভ করার বিধি বিশ্লেষণ করে বলা হয়েছে—

*তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।*
*উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥*

অর্জুন শরণাগতি, পরিপ্রশ্ন এবং সেবার মাধ্যমে তত্ত্ববেত্তা পুরুষের কাছে দিব্যজ্ঞান লাভ করার উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দিব্যজ্ঞান লাভ করার পন্থা টাকা ভাঙানোর মতো ব্যাপার নয় ; এই জ্ঞান লাভ করতে হয় সদ্গুরুর সেবা করার মাধ্যমে। ব্রহ্মাজী যেমন ভগবানের সন্তুষ্টি বিধান করার মাধ্যমে তাঁর কাছ থেকে এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন, তেমনই সদ্গুরুর প্রসন্নতা বিধান করার মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করতে হয়। গুরুদেবের সন্তুষ্টি বিধানই দিব্য জ্ঞান লাভ করার উপায়, পাণ্ডিত্যের মাধ্যমে দিব্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। বেদে (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ৬/২৩) ঘোষিত হয়েছে—

*যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।*
*তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥*

পরমেশ্বর ভগবান এবং গুরুদেবে যার অবিচলিত ভক্তি রয়েছে, তার কাছে দিব্যজ্ঞান আপনা থেকেই প্রকাশিত হয়। গুরু-শিষ্যের এই সম্পর্ক নিত্য। আজ যে শিষ্য, পরবর্তীকালে সে-ই গুরু হবে, এবং নিষ্ঠা সহকারে গুরুর আদেশ পালন করা ব্যতীত কখনই সদ্গুরু হওয়া যায় না। পরমেশ্বর ভগবানের শিষ্যরূপে ব্রহ্মাজী দিব্যজ্ঞান লাভ করেছিলেন এবং তিনি সেই জ্ঞান তাঁর প্রিয় শিষ্য নারদকে প্রদান করেছিলেন। আবার তেমনই নারদ গুরুরূপে সেই জ্ঞান ব্যাসদেবকে দান করেছিলেন। এইভাবে গুরুপরম্পরা ধারায় দিব্যজ্ঞান প্রবাহিত হয়। তাই তথাকথিত ঔপচারিক বা লৌকিক গুরু এবং শিষ্য ব্রহ্মা তথা নারদ এবং ব্যাসদেবের প্রতিরূপ হতে পারে না। ব্রহ্মা এবং নারদের যে সম্পর্ক তা বাস্তব, কিন্তু প্রতারক এবং প্রতারিতের যে তথাকথিত সম্পর্ক তা কেবল লৌকিকতা মাত্র। এখানে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, নারদমুনি যে কেবল শিষ্ট, বিনীত এবং বাধ্যই ছিলেন তাই নয়, তিনি আত্মসংযমীও ছিলেন। যে আত্মসংযমী নয়, বিশেষ করে যৌন জীবনে, সে কখনও শিষ্য অথবা গুরু হতে পারে না। পারমার্থিক পথে অগ্রসর হতে হলে অবশ্যই বাক্যের বেগ, মনের বেগ, ক্রোধের বেগ, জিহ্বার বেগ, উদরের বেগ এবং উপস্থের বেগ দমন করার শিক্ষা লাভ করতে হয়। এই বেগগুলি যিনি দমন করেছেন, তাঁকে বলা হয় গোস্বামী। গোস্বামী না হলে শিষ্য হওয়া যায় না অথবা গুরু হওয়া যায় না। ইন্দ্রিয় সংযমে অক্ষম তথাকথিত যে সমস্ত গুরু, তারা সকলেই প্রতারক এবং তাদের শিষ্যরা সকলেই প্রতারিত।

এই জগতের প্রপিতামহদের মতো ব্রহ্মাজীকে একজন মৃত প্রপিতামহ বলে মনে করা উচিত নয়। তিনি প্রাচীনতম বৃদ্ধ প্রপিতামহ এবং তিনি এখনও বর্তমান। নারদ

মুনিও এখনও বর্তমান। ব্রহ্মলোকের অধিবাসীদের আয়ু শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উল্লেখ করা হয়েছে। এই ক্ষুদ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের পক্ষে ব্রহ্মার একদিনের স্থিতিকাল গণনা করা কঠিন।

## শ্লোক ৪৪

**তস্মা ইদং ভাগবতং পুরাণং দশলক্ষণম্।**
**প্রোক্তং ভগবতা প্রাহ প্রীতঃ পুত্রায় ভূতকৃৎ ॥ ৪৪ ॥**

**তস্মৈ**—তারপর ; **ইদম্**—এই ; **ভাগবতম্**—ভগবানের মহিমা বা ভগবত্তত্ত্ব-বিজ্ঞান ; **পুরাণম্**—পুরাণ ; **দশলক্ষণম্**—দশটি লক্ষণ সমন্বিত ; **প্রোক্তম্**—বর্ণিত হয়েছে ; **ভগবতা**—পরমেশ্বর ভগবান কর্তৃক ; **প্রাহ**—বলেছেন ; **প্রীতঃ**—সন্তুষ্ট হয়ে ; **পুত্রায়**—পুত্রকে ; **ভূতকৃৎ**—ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা।

## অনুবাদ

**এরপর পিতা (ব্রহ্মা) তাঁর পুত্র নারদের প্রতি প্রসন্ন হয়ে দশটি লক্ষণ বিশিষ্ট ভাগবত-পুরাণ উপদেশ দিয়েছিলেন, যা তিনি স্বয়ং ভগবানের কাছ থেকেই প্রাপ্ত হয়েছিলেন।**

## তাৎপর্য

যদিও শ্রীমদ্ভাগবত চারটি শ্লোকে উক্ত হয়েছিল, কিন্তু তার দশটি লক্ষণ রয়েছে, যা পরবর্তী অধ্যায়ে বিশ্লেষণ করা হবে। চারটি শ্লোকে প্রথমে বলা হয়েছে যে ভগবান সৃষ্টির পূর্বে ছিলেন, এবং এইভাবে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু হয়েছে '*জন্মাদ্যস্য*' বেদান্ত সূত্রটির দ্বারা। যদিও *জন্মাদ্যস্য* হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের শুরু, তথাপি চারটি শ্লোকে বর্ণিত সৃষ্টি থেকে শুরু করে ভগবানের পরম ধাম পর্যন্ত সব কিছুরই মূল হচ্ছেন ভগবান, এবং তাতে দশটি লক্ষণের ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ভ্রান্তিবশত কখনো মনে করা উচিত নয় যে ভগবান কেবল চারটি শ্লোক বলেছিলেন এবং তাই শ্রীমদ্ভাগবতের অবশিষ্ট ১৭,৯৯৪টি শ্লোক অর্থহীন। যে দশটি লক্ষণের বিশ্লেষণ পরবর্তী পরিচ্ছেদে করা হবে, সেগুলির যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করার জন্য বহু শ্লোকের আবশ্যকতা রয়েছে। ব্রহ্মাজীও নারদকে প্রথমে উপদেশ দিয়েছেন তাঁর উপদিষ্ট জ্ঞান বিস্তার করার জন্য। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও শ্রীল রূপ গোস্বামীকে সংক্ষেপে এই উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং শিষ্যরূপে শ্রীল রূপ গোস্বামী তা বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করেছেন। সেই বিষয়কে আবার জীব গোস্বামী আরও অধিক বিস্তার করেন এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর আরও ব্যাপকভাবে বিস্তার করেন। আমরা কেবল সেই মহাজনদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার চেষ্টা করছি। অতএব শ্রীমদ্ভাগবত কোন সাধারণ উপন্যাস বা জড় সাহিত্য নয়। ভাগবতের শক্তি অপার, এবং ভক্ত তাঁর ক্ষমতা অনুসারে যতই বিস্তার করুক না কেন, ভাগবতের

বিস্তারের কখনও সমাপ্তি হবে না। শব্দরূপে ভগবানের অবতার হওয়ার ফলে শ্রীমদ্ভাগবত চার শ্লোকে বিশ্লেষিত হতে পারে অথবা চার কোটি শ্লোকে বিশ্লেষিত হতে পারে, ঠিক যেমন ভগবান হচ্ছেন পরমাণু থেকেও ক্ষুদ্র এবং অন্তহীন আকাশের থেকেও বৃহৎ। এমনই হচ্ছে শ্রীমদ্ভাগবতের শক্তি।

## শ্লোক ৪৫

**নারদঃ প্রাহ মুনয়ে সরস্বত্যাস্তটে নৃপ।**
**ধ্যায়তে ব্রহ্ম পরমং ব্যাসায়ামিততেজসে ॥ ৪৫ ॥**

**নারদঃ**—দেবর্ষি নারদ; **প্রাহ**—উপদেশ দিয়েছিলেন; **মুনয়ে**—মহামুনিকে; **সরস্বত্যাঃ**—সরস্বতী নদীর; **তটে**—তীরে; **নৃপ**—হে রাজন্; **ধ্যায়তে**—ধ্যানমগ্ন; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **পরমম্**—পরম; **ব্যাসায়**—শ্রীল ব্যাসদেবকে; **অমিত**—অসীম; **তেজসে**—শক্তিমান।

## অনুবাদ

**হে রাজন্! পরম্পরাক্রমে দেবর্ষি নারদ সরস্বতীর তীরে ভক্তিযোগে স্থিত হয়ে পরম সত্য পরমেশ্বর ভগবানের ধ্যানমগ্ন অনন্ত শক্তিসম্পন্ন ব্যাসদেবকে শ্রীমদ্ভাগবত উপদেশ দিয়েছিলেন।**

## তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথম স্কন্ধের পঞ্চম অধ্যায়ে নারদমুনি মহর্ষি ব্যাসদেবকে উপদেশ দিয়েছেন—

*অথো মহাভাগ ভবানমোঘদৃক*
*শুচিশ্রবাঃ সত্যরতো ধৃতব্রতঃ।*
*উরুক্রমস্যাখিলবন্ধমুক্তয়ে*
*সমাধিনানুস্মর তদ্বিচেষ্টিতম্ ॥*

"হে মহাভাগ্যবান, পবিত্র দর্শন, তোমার নাম এবং যশ সর্বব্যাপ্ত, এবং নিষ্কলুষ চরিত্র ও অবিচলিত দর্শনের মাধ্যমে তুমি পরম সত্যে স্থিত। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি তুমি অতুলনীয় কার্যকলাপসম্পন্ন পরমেশ্বর ভগবানের লীলার ধ্যান কর।"

অতএব ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের পরম্পরায় ধ্যানযোগের অভ্যাস উপেক্ষা করা হয় না। কিন্তু ভক্তেরা যেহেতু ভক্তিযোগী, তাই তাঁরা নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করার কষ্ট স্বীকার করেন না; পক্ষান্তরে এখানে যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, তাঁরা *ব্রহ্ম পরমম্* বা পরব্রহ্মের ধ্যান করেন। ব্রহ্মোপলব্ধির শুরু হয় নির্বিশেষ জ্যোতি থেকে, কিন্তু এই ধ্যানের ক্রমোন্নতির ফলে পরমাত্মার উপলব্ধি হয়; আরো উন্নতির পর পরমেশ্বর ভগবানের

উপলব্ধি হয়। ব্যাসদেবের গুরুরূপে নারদ মুনি ব্যাসদেবের স্থিতি সম্বন্ধে ভাল মতোই অবগত ছিলেন, এবং তাই তিনি তাঁর পারমার্থিক উন্নতির স্বীকৃতি দিয়ে বলেছেন যে তিনি গভীর নিষ্ঠাসহকারে পরম সত্যে স্থিত। নারদমুনি তাঁকে উপদেশ দিয়েছিলেন ভগবানের অপ্রাকৃত লীলাবিলাসের ধ্যান করতে। নির্বিশেষ ব্রহ্মের কোন লীলাবিলাস নেই, কিন্তু পরমেশ্বর ভগবান লীলাময় এবং তাঁর এই সমস্ত লীলা দিব্য, তাতে জড় গুণের লেশমাত্র নেই। পরব্রহ্মের লীলাসমূহ যদি জড় কার্যকলাপ হত, তা হলে নারদমুনি ব্যাসদেবকে তাঁর ধ্যান করতে উপদেশ দিতেন না। আর পরমব্রহ্ম হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণ, যা ভগবদ্গীতায় প্রতিপন্ন হয়েছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করার পর অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

*পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।*
*পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥*
*আহুস্তামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষিনারদস্তথা।*
*অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥*

অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করার মাধ্যমে ভগবদ্গীতার উদ্দেশ্য সারাংশ করে বলেছেন, "হে পরমেশ্বর ভগবান, আপনি পরম ব্রহ্ম, আপনি সচ্চিদানন্দময় শাশ্বত পুরুষ, এবং সেই তত্ত্ব নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাসদেব প্রমুখ সমস্ত ঋষিরা প্রতিপন্ন করেছেন, এবং আপনি স্বয়ং এখন তা প্রমাণ করছেন।" (*ভঃ গীঃ* ১০/১২-১৩)

ব্যাসদেব যখন ধ্যানে তাঁর চিত্তকে একাগ্র করেছিলেন, তখন তিনি তা করেছিলেন ভক্তিযোগের মাধ্যমে এবং তিনি মায়াসহ পরমেশ্বর ভগবানকে দর্শন করেছিলেন। পূর্বে আমরা আলোচনা করেছি যে ভগবানের মায়াও ভগবানেরইপ্রকাশ কেননা ভগবান ব্যতীত মায়ার অস্তিত্ব থাকতে পারে না। ঠিক যেমন অন্ধকার আলোক থেকে স্বতন্ত্র নয়। আলোকের অনুভূতি ব্যতীত অন্ধকারের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু এই মায়া ভগবানকে আচ্ছাদিত করতে পারে না, তিনি ভগবান থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকেন (*অপাশ্রয়ম্*)।

তাই ধ্যানের পূর্ণতা হচ্ছে তাঁর লীলাসহ পরমেশ্বর ভগবানের উপলব্ধি। নির্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান অত্যন্ত ক্লেশদায়ক, যে সম্বন্ধে ভগবদ্গীতায় (১২/৫) বলা হয়েছে—*ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।*

## শ্লোক ৪৬

**যদুতাহং ত্বয়া পৃষ্টো বৈরাজাৎ পুরুষাদিদম্।**
**যথাসীৎ তদুপাখ্যাস্তে প্রশ্নানন্যাংশ্চ কৃৎস্নশঃ॥ ৪৬॥**

**যৎ**—যা; **উত**—হয়; **অহম্**—আমি; **ত্বয়া**— তোমার দ্বারা; **পৃষ্ঠঃ**—জিজ্ঞাসিত হয়েছি; **বৈরাজাৎ**—বিরাট রূপ থেকে; **পুরুষাৎ**—পরমেশ্বর **ভগবানথেকে;**

**ইদম্**—এই জগৎ; **যথা**—যেমন; **আসীৎ**—ছিল; **তৎ**—তা; **উপাখ্যাস্তে**—আমি বিশ্লেষণ করব; **প্রশ্নান্**—সমস্ত প্রশ্ন; **অন্যান্**—অন্য; **চ**—ও; **কৃৎস্নশঃ**—বিস্তারিত ভাবে।

## অনুবাদ

**হে রাজন! ভগবানের বিরাট রূপ থেকে ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশ হয়, এবং অন্যান্য যে সমস্ত প্রশ্ন আপনি করেছেন সেগুলির উত্তর আমি পূর্বোক্ত চারটি শ্লোকের ব্যাখ্যা রূপে বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করব।**

## তাৎপর্য

শ্রীমদ্ভাগবতের শুরুতে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে যে এই মহান শাস্ত্রটি হচ্ছে বৈদিক কল্পবৃক্ষের সুপক্ক ফল, এবং তাই সৃষ্টি থেকে শুরু করে ব্রহ্মাণ্ড বিষয়ক যতকিছু প্রশ্ন সে সবেরই উত্তর শ্রীমদ্ভাগবতে দেওয়া হয়েছে। সেই উত্তরগুলি কেবল নির্ভর করে ব্যাখ্যাকারীর যোগ্যতার উপর। শ্রীমদ্ভাগবতের যে দশটি বিভাগের বিশ্লেষণ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী করেছেন, তাতে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে এবং বুদ্ধিমান ব্যক্তি তার যথার্থ সদ্ব্যবহার করার মাধ্যমে সর্বতোভাবে উপকৃত হতে পারবেন।

*ইতি "ভগবানের বাণীর বর্ণনার মাধ্যমে উত্তর" নামক শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বিতীয় স্কন্ধের নবম অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।*